বাংলাপিডিএফ
৯৯-১০০ দুই খণ্ড একত্রে
তীর ফলকের
গভীর রহস্য
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

দুই খণ্ড একত্রে

তীরফলকের গভীর রহস্য-৯৯

সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে-১০০

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ পি. কে. দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

রহমান তীরফলকটা নাসরিনের হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো।

নূরীর চোখেও বিস্ময়।

নাসরিন তাকিয়ে আছে স্বামীর মুখের দিকে।

রহমান বললো—আমার জন্য ভেবো না। তোমরা ইয়াকুবের দিকে লক্ষ্য দাও।

কায়েস ততক্ষণে ইয়াকুবের হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে।

সবাই মিলে আস্তানার ভিতরে প্রবেশ করলো। এতক্ষণ সবাই আস্তানার মুখে সমবেত হয়েছিলো।

রহমান একটিমাত্র হাত দিয়ে কি করে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে পরাজিত করে ইয়াকুবকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো—এটা বড় আশ্চর্যের কথা।

কিন্তু নাসরিন জানে, তার স্বামীর ক্ষমতা আছে, সাহস ও শক্তি আছে। যে কোনো অসাধ্য সাধনে সে বা তাদের সর্দার কোনোদিন বিফলকাম হয়নি।

তবুও স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে বসলো নাসরিন— কি করে তুমি ইয়াকুব ভাইকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলে?

আকাশের দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো রহমান— সব তার দয়া, বুঝলে নাসরিন?

কায়েস বললো—আমরা বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। হীরার কাছে সংবাদটা শোনার পরই তুমি ক্ষিপ্তের মত চলে গেলে। আমাদের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে...একটু থেমে বললো আবার—আমাকে যাবার সুযোগটাও তুমি দিলে না।

দরকার হয়নি। পুলিশ বাহিনী যখন গাড়ি নিয়ে সিন্দী পর্বতের সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে হাঙ্গেরী কারাগারের দিকে যাচ্ছিলো তখন হঠাৎ আমি আক্রমণ করে বসি। পুলিশবাহিনী হকচকিয়ে যায়, ঠিক বুঝতেই পারে না কে বা কারা তাদের উপর এইভাবে আক্রমণ চালালো। পুলিশবাহিনী মোটেই প্রস্তুত ছিলো না, মনে করেছিলো যে পথে তারা অগ্রসর হচ্ছে সে

পথের কথা কেউ জানে না। হীরাকে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না কায়েস, কারণ হীরা আমাকে সঠিক সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছিলো।

সত্যি তুমি জয়ী হবে আমি জানতাম। বললো নাসরিন।

কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার! কথাটা বলে রহমান কিছুটা আনমনা হয়ে গেলো।

বললো নাসরিন—বলো, থামলে কেন?

সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। আমি যখন পুলিশবাহিনীকে পরাজিত করে ইয়াকুবকে উদ্ধার করে নিয়ে আমার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছি, ঐ সময় একটা তীব্র আর্তনাদ আমার কানে ভেসে এলো। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, একজন রাইফেলধারী পুলিশ আমাকে লক্ষ্য করে রাইফেল উদ্যত করে ধরেছিলো। তক্ষুণি সে আমাকে গুলী করতো কিন্তু তার পূর্ব মুহূর্তেই পুলিশটির পিঠে একটি তীর এসে বিঁধলো। সহসা তীর তার পিঠে বিঁধে যাওয়ায় সে আর গুলী ছুড়বার সুযোগ পায়নি।

সবাই স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো রহমানের কথাগুলো। এক্ষণে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো রহমানের হাতের তীরফলকটির উপর।

কায়েস বললো—রহমান ভাই, আমার মনে হচ্ছে, সেই তীর নিক্ষেপকারী আপনার পরম হিতৈষী বন্ধু, সে আপনার রক্ষাকারী হিসেবে আস্তানা পর্যন্তও এসেছিলো।

তোমার অনুমান সত্য কায়েস। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে আমার জীবন রক্ষা করেছে, সে আমাকে অনুসরণ করে আমাদের আস্তানা পর্যন্ত এসেছে।

নূরীর মুখে কোনো কথা নেই। সে শুধু দেখে যাচ্ছে আর শুনে যাচ্ছে সব কথা। তার হুর আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, আর কোনোদিন তাকে দেখতে পাবে না, এটাই তাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছিলো। তার মনে তখন ঝড় বইছে, বনহুর তার সাথী—শুধু সাথী নয়, জীবনসাথী। তাকে সে জন্মের মতই হারিয়েছে। রহমান বনহুরের কোনো সংবাদ জানাতে পারেনি। সে কোথায় আছে তাও সে জানে না। ভালভাবে জিজ্ঞাসা করার মত সাহস তার হচ্ছে না। যদি কোনো অমঙ্গল কথা তার কানে প্রবেশ করে।

ইয়াকুবকে আস্তানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটি শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হয়, কারণ তার পিঠে গুলীবিদ্ধ হয়ে অনেক রক্তপাত হয়েছে। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে ইয়াকুব।

ইয়াকুব যখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলো তখন তার পাশে এসে বসলো রহমান। নূরী ও নাসরিন এসে দাঁড়ালো সেখানে।

কায়েস ইয়াকুবের পাশেই বসেছিল। সে আজ দু'দিন ইয়াকুবের সেবা-যত্ন নিজ হাতেই করছে।

আস্তানায় আসার পর বনহুরের প্রাইভেট ডাক্তার অপারেশন করে গুলীটা বের করে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন।

ইয়াকুব এখন অনেকটা সুস্থ।

রহমান এসে পাশে বসে বলে— এখন কেমন আছো ইয়াকুব?

ইয়াকুব চোখ তুলে তাকালো, বললো এখন অনেকটা ভাল আছি রহমান ভাই।

বললো রহমান কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

করো।

আমি হীরার মুখে জানতে পারলাম তুমি নিশো দ্বীপে যাচ্ছিলে তাদের মধ্যে কিছু সাহায্যদ্রব্য বিতরণের জন্য?

হাঁ।

কিন্তু পুলিশবাহিনী কি করে তা জানতে পারলো এবং তারা তোমাকে কি ভাবে বন্দী করলো?

ইয়াকুব বললো রহমান ভাই, তুমি তো অনেক দিন হলো আস্তানা ছাড়া রয়েছো। তাই অনেক সংবাদ তুমি জানো না। সে এক রহস্যপূর্ণ কথা।

রহস্যপূর্ণ কথা?

হাঁ।

কি রকম?

নূর বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে।

ইয়াকুবের কথাটা শুনে বলে উঠলো নূরী—নূর ফিরে এসেছে?

হাঁ আপামনি, নূর ফিরে এসেছে।

এ কথা এতদিন আমাকে বলোনি কেন?

আপনাকে কেন, কাউকেই আমি জানাইনি, কারণ নূর মস্তবড় গোয়েন্দা হয়ে ফিরে এসেছে কান্দাই শহরে এবং সে ফিরে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে আত্মনিয়োগ করেছে...

বলো কি ইয়াকুব!

হাঁ আপামনি, আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। বয়স কম হলেও তার দুর্দমনীয় সাহস দেখলে তুমি বিস্মিত হবে। এত অল্পবয়সে কেউ এমন দুঃসাহসী গোয়েন্দা হতে পারে না। পুলিশমহল তাকে পেয়ে ধন্য হয়েছে।

এসব কি বলছো ইয়াকুব!

সব সত্যি বলছি।

নূর ফিরে এসেছে, এ কথা আমাকে এতদিন না জানিয়ে ভুল করেছো।

ইয়াকুব নীরব রইলো।

রহমান বললো—ইয়াকুব ঠিকই করেছে নূরী।

কেন, আমি নূরকে ভালবাসিঁ না? সে কি আমার সন্তান নয়?

তাকে আমি বুকে করে মানুষ করিনি?

করেছো।

তবে কেন ইয়াকুব আমাকে জানায়নি? আমি দূর থেকে তাকে দেখে আসতাম। আমার জাভেদের চেয়ে আমি নূরকে বেশি ভালবাসি। রহমান ভাই, তোমরা জানো না সে আমার কতখানি...

জানি। জানি নূরী তুমি তাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসো কিন্তু...

কিন্তু কি বলো?

নূর তোমাকে চেনে না। হঠাৎ যদি তোমাকে সে দেখে, নিশ্চয়ই সন্দেহ করে বসবে।

না, নূর আমাকে সন্দেহ করতে পারবে না। আমি তাকে পরিচয় দেবো।

হাসলো রহমান—পরিচয় দেবে নূরী কিন্তু সে তোমার কথা বিশ্বাস করলে তো।

কেন করবে না? আমি তার মা...

নূরী, তুমি যা ভাবছো তা হবার নয়। নূর

না, নূর নয়, আমার মনি, সে আমার মনি। আমি তাকে মনি বলে ডাকবো।

ও নাম ওর মনে নেই। সে এখন মস্তবড় ডিটেকটিভ।

রহমান ভাই, আমি তাকে দূরে থেকে দেখে আসবো। ওর মধ্যে আমি আমার হুরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই—

নূরী, এখন তুমি যাও, ইয়াকুবের সঙ্গে আমার অনেক দরকারী কথা আছে।

না, আমি যাবো না, তুমি বলো।

বেশ, তবে কথা বলবে না, শুধু চুপ করে শুনবে কেমন?

বললো নূরী—আচ্ছা।

নাসরিন আর নূরী নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো।

বললো রহমান—ইয়াকুব?

বলো রহমান ভাই?

তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে? তোমার কষ্ট হবে না তো?

না, হবে না।

আচ্ছা, তুমি যখন নিশো দ্বীপে যাচ্ছিলে তখন কিভাবে পুলিশ বাহিনী তোমাকে ফলো করেছিলো?

আমি বুঝতে পারিনি। আমার পাশে যে ব্যক্তি বসেছিলো সে পুলিশ বাহিনীর লোক। ষ্টীমার যখন ছাড়লো তখন লোকটা আমার দিকে একটা অর্ধদগ্ধ সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললো—খাবে?

আমি বললাম— না, তুমি খাও, লাগবে না।

লোকটা করুণ কণ্ঠে বললো—তুমি বুঝি আমাকে ঘৃণা করছো?

আমি বললাম— না।

তবে আমার দেওয়া সিগারেট খেলে না কেন! ও বুঝেছি, তুমি খুব বড়লোক।

আমি ওর কথায় কোনো জবাব দিলাম না।

ও বললো—কাল থেকে আমার খাওয়া হয়নি, শুধু ধূমপান করে কাটাচ্ছি—

এমনভাবে লোকটা কথাগুলো বললো যা শুনে আমি ব্যথিত হলাম। বিশ্বাস করো রহমান ভাই, লোকটার মুখোভাব এত করুণ ছিলো কি বলবো।

তোমার বড় মায়া হলো, তাই না?

হাঁ, ঠিক বলছো।

তারপর?

তারপর আমি ওকে আমার ব্যাগ থেকে কিছু রুটি আর মাখন বের করে খেতে দিলাম।

সে খেলো?

হাঁ খেলো এবং বড় আনন্দ প্রকাশ করলো। তারপর আর সে আমার পিছু ছাড়লো না, আমাকে আমার কাজে সহায়তা করার জন্য আমার সাথে

নিশো দ্বীপে গেলো। আমাকে সে যেভাবে সাহায্যদান ব্যাপারে সহযোগিতা করলো তাতে আমি মুগ্ধ অভিভূত হলাম কিন্তু তখন জানি না সে ডিটেকটিভ, নিখুঁত অভিনয় করছিলো সে আমার সঙ্গে।

রহমান বললো—তখনই তোমার বোঝা উচিত ছিলো কেন সে তোমাকে এভাবে সহযোগিতা করছে। কি স্বার্থ ছিলো তার।

ইয়াকুব বললো—তার চালচলনে এতটুকু সন্দেহ করার মত কিছু ছিলো না। তাছাড়া তাকে আমি একজন দীনহীন নিঃস্ব মানুষ মনে করেছিলাম এবং তাকে আমি কিছু অর্থও সাহায্য করেছিলাম।

অবশ্য মানুষ চেনা বড় দায় তা সত্য। তোমাকে কেন এমনিভাবে সর্দারকেও একজন অভিভূত করেছিলো এবং তাকে বন্দীও করেছিলো সেবার। ইয়াকুব, তাহলে সেই গোয়েন্দার ইংগিতেই তুমি—

হাঁ রহমান ভাই, সে গোয়েন্দার ইংগিতেই আমাকে পুলিশবাহিনী গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। রহমান ভাই, সব শুনলে তুমি নিজেও অবাক হবে।

বলো?

ইয়াকুব বলতে লাগলো— নিশো দ্বীপে যারা দুঃস্থ অসহায় তাদের মধ্যে আমাদের সাহায্যদ্রব্য বিতরণ শেষ করে যখন ষ্টীমারে এসে বসলাম তখন দেখলাম, সে নেই।

তার মানে উধাও হয়েছে ঐ ব্যক্তি?

হাঁ, একেবারে উধাও—কিন্তু বেশিক্ষণের জন্য নয়, ষ্টীমার ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে এলো, তার পিছনে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ। আমি তো অবাক হতবাক, শুধু তাকিয়ে আছি। লোকটা আমাকে লক্ষ্য করে হেসে বললো, খুব অবাক হয়ে গেছো বন্ধু, তাই না? পুলিশবাহিনীকে দেখিয়ে বললো—এরা এসেছেন তোমাকে স্বাগতম জানাতে।

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালাম, কোনো কথা না বলে ব্যাপারটা মনে মনে অনুধাবন করছি। বললো লোকটা—যে ষ্টীমারে তুমি নিশো দ্বীপে দুঃস্থদের মধ্যে সাহায্যদ্রব্য বিতরণ করতে গিয়েছিলে, সেই ষ্টীমারেই এরা ছিলো, তুমি এদের দেখতে পাওনি—

আমি আরও অবাক হলাম, কারণ ষ্টীমারটি খুব বড় ছিলো না। ছোট্ট ষ্টীমার, মাত্র কয়েকজন যাত্রী নিয়ে ষ্টীমারখানা নিশোদ্বীপে যাচ্ছিলো। সেই ষ্টীমারে এতগুলো সশস্ত্র পুলিশ কোথায় আত্মগোপন করেছিলো ভেবে পেলাম

না। আরও একটা কথা ভেবে আরও বেশি অবাক হলাম, ষ্টীমারে আমি সাধারণ এক ব্যক্তি হিসেবে উঠে বসেছিলাম। আমাকে কেউ ফলো করবে, এটা ভাবতেই পারিনি—

ইয়াকুব, এ দুনিয়াটা এত সহজ নয়, বুঝলে।

জানি তাই অতি সতর্কতার সঙ্গেই আমি কাজ করে যাচ্ছিলাম অথচ তা সত্ত্বেও—

বলো, তারপর কি ঘটলো?

• ষ্টীমার যখন নিশো দ্বীপে ছেড়ে কান্দাই এসে পৌঁছলো তখন দেখলাম তিনখানা পুলিশ ভ্যান বন্দরে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর? রহমানের চোখ দু'টো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

অন্য যারা ইয়াকুবের শয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো তাদের দৃষ্টিতেও বিস্ময় ঝরে পড়ছে।

ইয়াকুব বলে চলেছে—যে ব্যক্তি আমাকে সহায়তা করার জন্য নিশো দ্বীপে গিয়েছিলো, সে পুলিশবাহিনীকে নির্দেশ দিলো আমি যেন পালাতে না পারি।

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঘেরাও করে ফেলা হলো। সেই লোকটা বললো— এসো বন্ধু।

তারপর পুলিশবাহিনীর পুলিশ ভ্যানে তুলে নেওয়া হলো আমাকে। তারপর পুলিশ অফিসে। তখন সেই ব্যক্তি মানে আমার সাহায্যকারী আমার সম্মুখে এসে দাঁড়লো এবং মুখের দাঁড়িগোঁফ খুলে ফেললো। একেবারে তাজ্জব ব্যাপার, যে ব্যক্তি দাড়িগোঁফে নিজের মুখমন্ডলকে একজন বৃদ্ধের মুখে রূপায়িত করেছিলো সে কিনা এক তরুণ। সে যে আমাদের সর্দারের মুখোচ্ছবি—

নূর! তাহলে নূর স্বয়ং গিয়েছিলো এক অসহায় ব্যক্তির ছদ্মবেশে তোমাকে ফলো করে নিশোদ্বীপে।

হাঁ রহমান ভাই, চিনতে আমার ভুল হয়।

তাই বলো, তাছাড়া কার এমন সাধ্য ছিলো তোমার চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে...রহমান কথাটা বলে থামলো।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে। তাই সে হেসে উঠে বললো, আমাকে ভুল করে সঙ্গী করে নিয়েছিলে, তাই মনে মনে নিজকে ধিক্কার দিচ্ছো, তাইনা?

তুমি কি জবাব দিলে? বললো রহমান।

ইয়াকুব বললো—আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। তখন ভাবছি সর্দারের ছেলে, তাই সে এমন দুঃসাহসী।

ঠিকই বলেছো ইয়াকুব, ওর দেহে আছে কার রক্ত, একবার ভেবে দেখেছো? কথাটা বললো নূরী।

রহমান বললো—নূর যখন শিশু ছিলো তখন তার চোখেমুখে আমি দেখেছি এক বিস্ময়কর দীপ্ত ও দৃঢ়তা। তার দৃষ্টিতে ঝরতে দেখেছি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। নূর তাহলে ছদ্মবেশে তোমাকে ফলো করেছিলো এবং কৌশলে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছিলো।

হাঁ, তাছাড়া কারও সাহস ছিলো না আমাকে বন্দী করে?

সাহস নয় বুদ্ধি বলো...এমন বুদ্ধি আর কৌশল কার আছে। বলো তারপর? বললো রহমান।

ইয়াকুব বললো এবার—নূর আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললো, কি ভাবছো। তা যাই ভাবো, আর তোমার রেহাই নেই। তোমাকে বলতে হবে তোমাদের সর্দার কোথায়।

আমি অবাক হবার ভান করে বললাম—সর্দার!

বললো নূর—হাঁ, তোমাদের সর্দার।

আমি বললাম—আমিই তো সর্দার। আমাদের সর্দার আমিই।

বললো নূর—মিথ্যা কথা, বলো দস্যু বনহুর কোথায়?

চমকে উঠার ভান করে বললাম—দস্যু বনহুরের নাম শুনেছি কিন্তু তাকে আজও চোখে দেখিনি, আমি কেমন করে বলবো দস্যু বনহুর কোথায়!

নূর হেসে উঠলো।

তার সঙ্গে হেসে উঠলো উপস্থিত পুলিশ অফিসারগণ।

নূর বললো—চমৎকার অভিনয় জানো তোমরা। দস্যু বনহুরের লোক যে তুমি তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার।

মনে মনে আমি বিস্মিত হলাম তার দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে। সত্যিই সে আমাদের সর্দারের উপযুক্ত সন্তান বটে। সেও যেমন আমাকে চিনে নিয়েছিলো আমি দস্যু বনহুরের লোক, তেমনি আমিও তাকে চিনে নিয়েছিলাম মুখের দাড়ি-গোফ খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে...

বললো নূরী—আমি যে আর দেরি করতে পারছি না। আমি নূরকে দেখতে যাবো। রহমান ভাই, আমাকে তোমরা বাধা দিও না। আমি যাবো আমার হুরের সন্তান নূরকে দেখতে।

তা হয় না নূরী।

কেন হবে না? আমি আমার জাভেদকে আশার হাতে সমর্পণ করেছি—কত ত্যাগ আমি স্বীকার করেছি অপরের জন্য। আর নূরের প্রতি কি আমার কোন দাবি থাকতে পারে না? আমি নূরকে দেখতে যাবো। নূরের মধ্যে আমি আমার হুরের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাই।

বেশ যেও, কিন্তু পরে। আমি যেদিন বলবো সেদিন যেও। কথাগুলো বললো রহমান।

আমি কারও কথা শুনবো না, নূরকে দেখতে যাবোই। ছুটে বেরিয়ে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়াতেই পথরোধ করে দাঁড়ালো। একজন, বললো—না, তোমার যাওয়া চলবে না নূরী!

কে কে তুমি...হুর!

হাঁ, হাঁ নূরী।

তুমি ফিরে এসেছো! তুমি বেঁচে আছো হুর!

সঙ্গে সঙ্গে সবাই কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর বললো—বেঁচে আছি। আর বেঁচে আছি বলেই তো ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছি। বনহুরের দৃষ্টি প্রথমেই রহমানের উপর গিয়ে পড়লো। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো বনহুর—তোমার এক হাত নেই!

রহমান মাথা নত করে বললো—সর্দার, জীবনে বেঁচে আছি এটাই আমার ভাগ্য।

রহমান!

হাঁ সর্দার।

তেমনি আমিও হারিয়েছি—তবে দেহের কোনো অংগ নয়, আমি হারিয়েছি দিপালীকে।

দিপালী! সে কোথায় সর্দার?

বললো বনহুর—এখন নয়, পরে সব বলবো। কিন্তু আমি আর একটি অমূল্য সম্পদ এনেছি যা হারিয়েছিলাম বেশ কয়েক বছর পূর্বে—এই সেই আমাদের ফুল্লরা।

এতক্ষণ কেউ ভালভাবে লক্ষ্য করেনি, সবাই বনহুরকে ফিরে পেয়ে অভিভূত, আত্নহারা হয়ে পড়েছিলো। কোনোদিকে তাদের খেয়াল ছিলো না। এবার দেখলো বনহুরের থেকে বেশ কিছু দূরে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী।

বনহুর ওর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে বললো— এই আমাদের হারানো রত্ন ফুল্লরা।

নাসরিন আর রহমান যেন বোবা বনে গেছে।

এতটুকু ফুল্লরা হারিয়ে গিয়েছিলো, আজ একি দেখছে-এ যে অনেক বড় অনেক সুন্দর এক তরুণী।

নাসরিন ছুটে গিয়ে ফুল্লরাকে আঁকড়ে ধরে ওর ললাটে, মুখেচোখে অবিরাম চুমু দিয়ে বললো—কি যে খুশি সে হয়েছে তা যেন ভাষায় বলতে পারছে না।

ফুল্লরাকে ফিরে পাবে, এ যেন তার কল্পনার বাইরে ছিলো। রহমানকে লক্ষ্য করে বললো নাসরিন—ওগো দেখো দেখো, ফুল্লরা...আমার ফুল্লরা কত বড় হয়েছে। এসো, ওকে আদর করবে না?

ফুল্লরা কিন্তু নীরব, চোখেমুখে বিস্ময়।

বনহুর বললো—ফুল্লরা, ওরা তোমার বাবা-মা। তুমি বুঝি চিনতে পারছো না?

রহমান ফুল্লরার পাশে গিয়ে গভীর স্নেহে তার মাথায়, কপালে হাত বুলিয়ে ডাকলো—মা ফুল্লরা!

ফুল্লরা অবাক হয়ে তাকালো রহমানের মুখের দিকে।

অনেক দিন আগের একটি মুখ ভেসে উঠে ফুল্লরার চোখের সামনে...তার বাপুজী রহমান...কিন্তু আজ যাকে দেখছে সেই কি সে...

বললো বনহুর—ফুল্লরা, এই সেই তোমার বাপুজী। এই তোমার মা নাসরিন! কথাগুলো বলে ফিরে তাকালো বনহুর নূরীর দিকে।

নূরী এতক্ষণ আনন্দে আত্নহারা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো এক পাশে। বনহুর তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে দ্রুত চলে যায় সেখান থেকে।

রহমান ও নাসরিন যখন ফুল্লরাকে পেয়ে আনন্দে অভিভূত তখন বনহুর বেরিয়ে যায় নূরীর পিছু পিছু।

নূরী কিন্তু সোজা গিয়ে হাজির হলো নিজের কক্ষে। অভিমানে চোখ দুটো তার ছলছল করছে। এতদিন সে কোথায় ছিলো, কেন সে আস্তানায় আসেনি—নানা প্রশ্ন তাকে ব্যথিত করে তুলছিলো।

শয্যায় বসে মুখ ফিরিয়ে রইলো নূরী।

বনহুর এসে দাঁড়ালো তার পাশে। নূরীর অভিমানভরা চোখ দুটো তার মনেও ব্যথা জাগাচ্ছে কিন্তু সে তো ইচ্ছাকৃতভাবে আস্তানা ছেড়ে ছিলো না। তার ভাগ্য তাকে এই অবস্থায় উপনীত করেছিলো। বনহুর নূরীর কাঁধে হাত রাখলো—নূরী!

নূরী কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর ওর মুখখানা তুলে ধরে বললো— রাগ করোনা নূরী, সব বলবো তোমাকে। তুমি সব শুনলে খুব অবাক হবে।

নূরী চোখ তুললো।

বনহুর বললো—তোমরা জানো না নূরী। আমি আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবো, এ ভরসা আমার ছিলো না।

নূরী বললো—কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

অনেক দূরে...বললে হয়তো বিশ্বাস করতেই চাইবে না। নূরী, তুমি শুনেছো মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে, আর আমি গিয়েছিলাম মঙ্গল গ্রহে...

মঙ্গল গ্রহ!

হাঁ।

তুমি মঙ্গল গ্রহে গিয়েছিলে?

তুমি তা বিশ্বাস করছো?

অন্য কেউ বললে আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আমি জানি তুমি যা বলবে সব সত্য।

তাহলে শোনো—বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে—নূরী, আর কোনোদিন তোমাদের পাশে ফিরে আসতে পারবো, এ বিশ্বাস আমার ছিলো না। সে এক বিস্ময়কর কাহিনী। কোনোদিন এমন দেশে যাবো বা যেতে পারবো আমিও কখনও ভাবিনি। সে যেন এক কল্পনা পৃথিবী ছাড়াও কোনো কোনো গ্রহে মানুষ রয়েছে, যা আজ আমার কাছে আর অবিশ্বাস্য নয়। পৃথিবীর মানুষের চেয়ে আরও বেশি উন্নত তারা। যে দেশের মাটি-আলো-বাতাস পৃথিবীর চেয়ে বেশি তৃপ্তিদায়ক।

নূরী শুনে যাচ্ছে।

বনহুর বলছে।

নূরীর দু'চোখে বিস্ময়, সে যত শুনছে ততই যেন অভিভূত হয়ে পড়ছে। ও দেশের মানুষগুলো মোমের পুতুলের মত দেখতে, এক একজন জীবিত থাকে প্রায় হাজার বছর। যে দেশের মাটির বুকে ছড়িয়ে আছে অগণিত মনিমুক্তা আর মহামূল্যবান পাথর, যার মূল্য সাত রাজার ধন।

সত্যি বলছো? কেমন আশ্চর্য লাগছে শুনে।

হাঁ নূরী। আমি জানি, শুধু মঙ্গল গ্রহেই নয়, চন্দ্রপৃষ্ঠেও অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে যা এখনও পৃথিবীর মানুষ আবিস্কার করতে সক্ষম হয়নি।

নূরী বললো—আমি শুনেছি মহাশূন্য অথবা সৌরজগৎ থেকে নাকি একটা অদ্ভুত যান মাঝে মাঝে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। তাহলে কি সেই যানটি কোনো গ্রহ থেকে আসে?

এটা সুনিশ্চিত যে, পৃথিবী ছাড়াও বিভিন্ন গ্রহে জীবজন্তু এবং মানুষ বাস করে এবং তারাও মানুষের চেয়ে জ্ঞান-গরিমায় কোনোদিকে কম নয়। তার প্রমাণ সেই অদ্ভুত যান থেকে বিস্ময়কর আলোকরশ্মি পৃথিবীর মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে, এমন কি অনেক ক্যামেরাম্যান সেই অদ্ভুত যানের ফটো উঠিয়েছিলেন যা আমরা সংবাদপত্রে দেখেছি। একটু থেমে বললো—আমার মনে হয় সে যানটি মঙ্গল গ্রহ থেকেই ভূ-পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়।

হুর, কেমন যেন আজগুবি মনে হচ্ছে তোমার কথাগুলো সব যেন কল্পনাময়।

হাঁ, তাই মনে হয়। যেমন চাঁদ...চাঁদ আমাদের কল্পনারাজ্য। চাঁদকে নিয়ে কবিরা কবিতা লিখেন, সাহিত্যিকগণ সাহিত্য রচনা করেন, পল্লীবধূগণ চাঁদকে নিয়ে গীত গায়। বৃদ্ধারা চাঁদের দেশের কত কাহিনী বলে শিশুদের মনে বিস্ময় জাগায়। যে চাঁদ আমাদের শুধু কল্পনায় ছিলো, আজ সেই চন্দ্রপৃষ্ঠে পৃথিবীর মানুষ অবতরণ করে সেখানের পাথর-মাটি আনতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ অন্যান্য গ্রহে যাওয়ার জন্য নানাভাবে গবেষণা চালিয়ে চলেছে। সফলও হবে বলে আশা করি। নূরী, এই বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীর মানুষের অসাধ্য কিছু নেই, বুঝলে? হঠাৎ হেসে উঠলো বনহুর।

নূরী অবাক কণ্ঠে বললো—হাসছো যে?

আমি সৌরজগতে গিয়েছিলাম এ কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু আজ কিছুই অলৌকিক বা কল্পনা নয়, তাই হাসছিলাম তোমাদের কথা শুনে......

যাক, অনেক রাত হলো, এবার ঘুমাও। তুমি বড় ক্লান্ত।

হাঁ নূরী ঘুমাবো। কতদিন তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাইনি। কিন্তু একটা কথা, জাভেদকে দেখছিনা কেন?

সে ভালই আছে।

কোথায় সে?

নূরী আমতা আমতা করে বললো—আশা ওকে নিয়ে গেছে।

আশা!

হাঁ।

ও বুঝেছি।

কি বুঝেলে।

নাইবা শুনলে সে কথা নূরী।

হুর, আমি জানি আশার প্রতি তোমার দুর্বলতা আছে।

বনহুর এবার শয্যায় চীৎ হয়ে শুয়ে পড়লো।

নূরী বললো—এখনও তোমার সে অভ্যাস যায়নি। বুট সহ শয্যা গ্রহণ! কথাটা বলে নূরী বনহুরের বুট দুটো পা থেকে খুলে রাখলো।

বনহুর নূরীকে গভীর আবেগে টেনে নিলো বুকে।

তীর-ধনু সহ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো জাভেদ। শরীরে তার জমকালো ড্রেস, পায়ে ভারী বুট, মাথায় পাগড়ি, কালো রুমালে মুখের নিচের অংশ ঢাকা।

অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে।

আশা এসে জাভেদের অশ্বের লাগাম চেপে ধরলো। কিন্তু দৃষ্টি তার জাভেদের মুখের দিকে স্থির হয়ে আছে।

তীর-ধনু বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে খুলে ফেললো মুখের রুমালখানা, তারপর হেসে বললো—কি দেখছো মাম্মী আমার মুখে?

তোমার মুখ।

কেন, আজ কি নতুন দেখছো আমার মুখ?

না।

তবে যে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলে?

তোমার মুখে আমি খুঁজে পাই আমার......না থাক সব কথা তোমার শুনে কাজ নেই। আচ্ছা জাভেদ, তুমি ঠিকমত কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলে তো?

হাঁ মাম্মী, আমি তোমার নির্দেশমত কাজ করেছি এবং সফলকামও হয়েছি।

তাহলে ইয়াকুবকে উদ্ধার করতে পেরেছে ওরা।

পেরেছে। জয়যুক্ত হয়েছে রহমান চাচা।

পুলিশবাহিনীর লোক নিহত বা আহত হয়েছে কি?

বাধ্য হয়ে আমি একজনকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করেছি।

তোমাকে না বারণ করেছিলাম কাউকে হত্যা করবে না?

উপায় ছিলোনা তাই।

রহমানের গুলীতে কেউ নিহত হয়েছে?

হাঁ হয়েছে, চার-পাঁচ জন......

বলো কি জাভেদ?

হাঁ মাম্মী, আমি যাবার পূর্বেই রহমান চাচার সঙ্গে পুলিশ-বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

যাক, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ইয়াকুব উদ্ধার পেয়েছে, এটাই আমাদের কাম্য ছিলো।

জাভেদ এবার আশার হাতে তীর-ধনু তুলে দিয়ে বললো—রাখো মাম্মী।

বললো আশা—ঘোড়াটাকে ঘোড়াশালে রেখে এসো, কথা আছে।

জাভেদ এবার আশার হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম নিজের হাতে নিলো।

এখানে যখন আশা আর জাভেদ কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন কান্দাই শহরে পুলিশ অফিসের একটা কক্ষে উত্তেজিতভাবে পায়চারী করছে নুরুজ্জামান চৌধুরী নূর। তার চোখেমুখে উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠেছে।

পুলিশ অফিসার মিঃ শফিউল এবং মিঃ জাহেদী বসে আছেন। তাঁদের চোখেমুখেও উদ্বিগ্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নূর ফিরে দাঁড়ালো—মিঃ শফিউল, আমি ভেবে পাচ্ছি না, কি করে এতগুলো পুলিশকে পরাজিত করে একজন পঙ্গু লোক বন্দীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো?

আমারও সেই প্রশ্ন মিঃ জামান চৌধুরী। বললেন মিঃ শফিউল।

মিঃ জাহেদী বললেন—আমি এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে, শুধু ঐ পঙ্গু লোকটাই এতগুলো সশস্ত্র পুলিশকে কাহিল করতে পেরেছে। নিশ্চয়ই ওর সাহায্যকারী কেউ ছিলো এবং সে আর কেউ নয়—স্বয়ং দস্যু বনহুর।

মিঃ শফিউল বললেন—দস্যু বনহুরের নাম বেশ কিছুদিন উবে গিয়েছিলো, আবার তাহলে দস্যু বনহুর আবির্ভূত হলো।

নুরুজ্জামান বললো— আপনারা যাই বলুন, দস্যু বনহুর কোনোদিন উবে যায়নি, সে আত্মগোপন করেছিলো।

মিঃ জামান যা বলছেন তা সত্যও হতে পারে। তবে দস্যু বনহুর অনেকদিন নীরব রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাঁ, নীরব রয়েছে সে, অথবা অন্য কোথাও ছিলো, যার জন্য তার অনুচরগণ তার স্থানে কাজ করছে। যাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলাম সে দস্যু বনহুরের অনুচর। বললো জামান চৌধুরী।

মিঃ জামান, আপনার কথা সত্য এবং বিশ্বাস করি। দস্যু বনহুরের অবর্তমানে তার অনুচরগণ কাজ করছিলো এবং আমি ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করার পরই ওকে গ্রেপ্তার করেছিলাম।

মিঃ শফিউল, আমি বিস্মিত হচ্ছি পঙ্গু লোকটার হাতে নাকি পিস্তল ছিলো কিন্তু পুলিশবাহিনীর নিহত যোয়ানদের মধ্যে এক জনের পিঠে তীরবিদ্ধ ছিলো। জামান কথাটা বলে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। তার তরুণ মুখমন্ডলে একটা গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে।

বন্দীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং কয়েকজন পুলিশ নিহত হওয়ায় পুলিশমহলে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। দস্যু বনহুরের চেহারা অনেকে দেখেনি কিন্তু তার চেহারার বর্ণনা প্রায় সকলে জানে, তাই যে সব পুলিশ সিন্দী পর্বতের সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলো, তারা ফিরে এসে যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে পুলিশমহল বেশ বুঝতে পেরেছে দস্যু বনহুর সেখানে আসেনি, তবে আড়াল থেকে সাহায্য করেছে কিনা তা সঠিক বলা মুস্কিল। জেরা শেষ হয়েছে। কয়েকজন পুলিশকে আহত অবস্থায় হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতদের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশমহল অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলোচনা চালিয়ে চলেছে।

নুরুজ্জামান নিজে ছদ্মবেশে সন্ধান চালিয়ে চলেছে, তার দৃঢ় সংকল্প দস্যু বনহুরকে সে গ্রেপ্তার করবেই।

পুলিশমহল তাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়ে চলেছে। তাকে শহরের নির্জন স্থানে বিরাট একটা বাড়ি দেওয়া হয়েছে। বাড়িটা নুরুজ্জামানের খুব পছন্দ, কারণ এমনি একটি নির্জন বাড়িই সে চেয়েছিলো। মা মনিরা এবং দাদী মরিয়ম বেগম তাকে বাড়িতেই থাকার জন্য বলেছিলো, এমন কি বেশ দুঃখও পেয়েছিলো তবু নূর রাজি হয়নি বাড়িতে থাকতে। কারণ সে বাড়ি থেকে ইচ্ছামত কাজ করতে সক্ষম হবে না, এটাই ছিলো তার ধারণা।

পুলিশমহল তাকে সায় দিয়েছিলো এ ব্যাপারে।

নূর যখন বাড়ি ছেড়ে দূরে অন্য একস্থানে চলে যাবে বলে মনস্থির করে নিয়ে ছিলো তখন মনিরা অভিমানভরা কণ্ঠে বলেছিলো, ভেবেছিলাম বিদেশ থেকে ফিরে আমার কাছাকাছি থাকবি।

নূর বলেছিলো—তা কি হয় আম্মু। সব সময় ছেলেকে কি কোলের কাছে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাও তুমি?

নাই বা রইলি কোলের কাছে তবু তো দিনে একটাবার তোকে দেখতে পেতাম!

মনিরার কথায় বলেছিলো নূর—যখনই তুমি আমাকে দেখতে চাইবে তখনই আমি হাজির হবো তোমার পাশে।

সত্যি বলছিস তো?

আম্মু, আমি কোনোদিন মিথ্যা বলিনি, বলবো না। জানো আম্মু, বাড়িতে থেকে কোনোদিন কোনো কাজ সমাধা হয় না। তাছাড়া আমি একজন গোয়েন্দা। নানা সময় নানা ধরনের মানুষ আমার কাছে আসা-যাওয়া করবে। এতে বাড়ির সুনাম নষ্ট হতে পারে।

মরিয়ম বেগম বলছিলেন—বৌমাকে আমি বোঝাবো, তুই যা নূর। বাড়িতে তোকে বন্দী করে রাখতে চাই না।

শাশুড়ির কথার পর মনিরা আর কোনো আপত্তি জানাতে পারেনি। শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলেছিলো, তোর যা ভাল লাগে তাই কর্ নূর। তোর কাজে আমি বাধা দেবো না।

মায়ের কথায় নূর কোনো জবাব দিতে পারেনি। কারণ সে জানে, মায়ের মনে কত ব্যথা জমাট বেঁধে আছে। মাকে নূর কোনদিন প্রাণ খুলে

হাসতে দেখেনি। সদা বিষণ্ন মলিন দেখেছে সে। তার আব্বা অতি মহৎ ব্যক্তি, তাঁর মহত্ত্বের কাছে সবাই যেন হার মানে। আব্বাকে নূর জীবনে কমই কাছে পেয়েছে কিন্তু আব্বার মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে এক ব্যক্তিত্বতার পূর্ণ পুরুষকে। মা যে তার আব্বার জন্য সদা বিমর্ষ থাকেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ কোন নারী না চায় তার স্বামীকে নিতান্ত কাছে নূর জানে তার আব্বা দূরদেশে চাকরি করেন তাই তিনি সবসময় আসেন না বা আসতে পারেন না।

মাঝে মাঝে নূরের মনে ভীষণ রাগ হতো তার আব্বার উপর। কেন তিনি তাকে এবং তার মাকে ছেড়ে চলে যান। অবশ্য এখন সে রাগ-অভিমান আর নেই। পিতাকে সে জন্মাবার পর থেকেই পাশে পায়নি, তাই সেই অভ্যাসটাই তার সয়ে গেছে।

এখন নূর তার আব্বার কথা মায়ের সম্মুখে তোলে না। সে লক্ষ্য করেছে আব্বার কথা তুললে মা সেখান থেকে সরে যান অথবা বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তাই নূর ইচ্ছা থাকলেও পিতার কথা এড়িয়ে চলে সর্বক্ষণ।

মায়ের মন ব্যথাকাতর হলেও নূর পুলিশমহলের দেওয়া বাড়িখানা ত্যাগ করতে পারলো না। কারণ নিজের বাড়িতে থেকে তার কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তবে মাকে সে কথা দিয়েছে রোজ না হলেও সে একটি বার নিজ বাড়িতে আসবে।

দাদীমাকেও নূর বুঝিয়ে দিয়েছে ভালভাবে।

মরিয়ম বেগম হেসে বলেছেন, কতদিন এমনি করে আমাদের ছেড়ে ছেড়ে থাকতে পারবি দেখে নেবো। বৌ এলে তখন আর বাড়ি ছেড়ে নড়তেই চাইবি না, কারণ বৌকে আর তোর কাছে ছেড়ে দেবোনা তো?

সেদিন হেসে বলেছিলো নূর—দাদী, বৌ আনলে তো আসবে। আমি বৌ আনবোই না দেখেনিও।

বলেছিলেন মরিয়ম বেগম—আচ্ছা দেখে নেবো।

নূর নিজ কক্ষে শুয়ে শুয়ে ভাবছে সিন্দী সুড়ঙ্গ পথের পুলিশ বাহিনীর পরাজয়ের কথা। এ পরাজয় যেন পুলিশ বাহিনীর নয়, তার পরাজয়। কারণ সে ব্যক্তিটিকে কৌশলে গ্রেপ্তার করেছিলো সে, কৃতিত্ব ছিলো তার। এত সুন্দর একটা সুযোগ তাদের নষ্ট হয়ে গেলো। নূর যতই ভাবছে ততই বেশি উত্তেজিত হচ্ছে। অস্বস্তি বোধ করছে। কিছুক্ষণ এ পাশ ও পাশ করে উঠে দাঁড়ালো বিছানা ছেড়ে।

সিগারেট কেস্‌টা হাতে তুলে নিতেই সম্মুখে দৃষ্টি পড়লো। দেয়ালে একটা ছায়া পরিলক্ষিত হতেই ক্ষিপ্র গতিতে ফিরে দাঁড়ালো নূর। সমস্ত শরীরে জমকালো পোশাক, মাথার পাগড়িতে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। হাতে জমকালো রিভলভার।

নূর চমকে না উঠলেও বিস্মিত হলো।

দস্যু বনহুরের যে বর্ণনা সে পুলিশ রিপোর্টে পেয়েছে, এই জমকালো মূর্তির সঙ্গে তার হুবহু মিল আছে। মুহূর্তে নূরের পর্দায় ভেসে উঠলো সেই প্রতিশ্রুতি। নূর টেবিলের ড্রয়ার খুলতে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি গম্ভীর গলায় বলে উঠলো—ড্রয়ারে হাত দিও না নূর। আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি। তোমার কোনো ক্ষতি আমি করতে আসিনি।

কে তুমি? বললো নূর।

জমকালো মূর্তি পূর্বের ন্যায় ভারী গরায় বললো— যাকে তুমি খুঁজে ফিরছো আমি সেই...

তুমি! তুমি দস্যু বনহুর?

হাঁ। শোনো নূর, তুমি দস্যু বনহুরকে খুঁজে ফিরছো তাই এলাম। কিন্তু মনে রেখো, তোমরা বাসনা পূর্ণ হবার নয়।

বনহুর। তুমি এসেছো, জানো এই মুহূর্তে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করতে পারি।

বনহুর অট্টহাসি হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো নূর এত দিন সে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে নানা রকমের কথা শুনে এসেছে অনেকের মুখে। পুলিশ রিপোর্টেও জেনেছে অনেক কিছু। এতদিন দস্যু বনহুরকে নিয়ে নূর কত রকম চিন্তা-ভাবনা করেছে। কিন্তু আজ সেই দস্যু বনহুর তার সম্মুখে উপস্থিত...

হাসি থামিয়ে বললো বনহুর—নূর, তুমি যা ভাবছো জানি কিন্তু আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। শোনো নূর, তুমি বিদেশ থেকে স্বনামধন্য ডিটেকটিভ হয়ে ফিরে এসেছো, এটা শুধু কান্দাইয়ের গৌরব নয়, গোটা বিশ্বের গৌরব...

বনহুরের কথার মাঝ খানে বলে উঠলো—বনহুর, তুমি আমাকে যত মিষ্টি কথায় ভোলাতে চেষ্টা করোনা কেন, তাতে সন্তুষ্ট নই, কারণ তুমি শুধু কান্দাইবাসীর আতঙ্ক নও, তুমি গোটা বিশ্ববাসীর সন্ত্রাস।

তুমি ভুল করছো তরুণ ডিটেকটিভ। দেশের জনগণের শত্রু আমি নই, বন্ধু বলতে পারো। তবে হাঁ, যারা দেশের শত্রু আমি তাদের যমদূত। আজ আর নয়, আবার দেখা হবে। কথাটা বলে ক্ষিপ্রগতিতে বেরিয়ে যায় বনহুর।

নূর দ্রুতহস্তে ড্রয়ার খুলে বের করে নেয় রিভলভারখানা এবং ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় বেলকুনির ধারে।

অন্ধকারে নূর গুলী ছুড়ে।

ততক্ষণে শুধু অশ্বপদ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

নূর ছুটে আসে নিজ শয়নকক্ষে।

গাড়ির চাবিটা বালিশের তলা থেকে নিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নেমে আসে নিচে। বারান্দায় গাড়ি ছিলো, নূর দ্রুত গাড়ির দরজা খুলে চেপে বসলো ড্রাইভিং আসনে। ষ্টার্ট দিলো গাড়িতে, গাড়ি নিমিষে বেরিয়ে গেলো ফটক পেরিয়ে।

ঘোড়ার খুরের শব্দ লক্ষ্য করে গাড়ি ছুটালো নূর।

উল্কাবেগে ছুটে চললো গাড়িখানা, সামনে শোনা যাচ্ছে অশ্ব খুরের শব্দ। ক্রমেই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে অশ্বপদশব্দ।

নূরের গাড়ি থেমে পড়লো।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো নূর সামনের আধো অন্ধকার রাস্তাটার দিকে।

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাত।

লাইটপোষ্টগুলোকে এক একটা প্রহরীর মত মনে হচ্ছে। আলোগুলো ঝাপসা, পথের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে মাত্র।

রাত তখন গভীর।

কোনো গির্জা থেকে ভেসে এলো ঘন্টাধ্বনি।

রাত দুটো বাজলো।

নূর ব্যাক করে গাড়ির মুখ ফিরিয়ে নিলো। তারপর সে সোজা ফিরে এলো নিজ বাসায়। গাড়ি নিয়ে বহুদূর সে চলে গিয়েছিলো, একেবারে কান্দাই শহরের শেষ প্রান্তে বলা যায়।

গাড়ি ফটকে প্রবেশ করলো।

নূরের মনে হলো কেউ যেন ফটকের পাশ থেকে সরে গেলো আড়ালে।

নূর লক্ষ্য করেও না করার ভান করলো এবং গাড়ি বারান্দায় গাড়ি রেখে সোজা উঠে গেলো উপরে।

সমস্ত রাত নূরের দুচোখে ঘুম এলো না।

সে শুধু ভেবে চলেছে, যাকে সে এতদিন কল্পনা করে এসেছে, সেই বিশ্ববিখ্যাত দস্যু তার সামনে আবির্ভূত হয়েছিলো, এ যেন এক বিস্ময়। নূর দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করবে, এটা তার আজকের বাসনা নয়, শিশুকাল থেকেই তার মনে এই কথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বারবার। আজ সেই দস্যু বনহুর স্বয়ং তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিলো!

নূর তার কণ্ঠস্বর শুনেছে।

তাকে ভালভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু এত কাছে পেয়েও গ্রেপ্তার করতে পারলো না। নূর অধর দংশন করতে লাগলো।

রাতেই সংবাদটা সে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছে পুলিশমহলকে।

এ ব্যাপার নিয়ে পুলিশমহলেও সাড়া পড়ে গেছে। এতদিন দস্যু বনহুরের উপদ্রব কম ছিলো, তার নাম তেমন শোনা যেতো না কিন্তু আবার নতুনভাবে দস্যু বনহুরকে নিয়ে দেশবাসী মুখর হয়ে উঠলো।

নূর সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে দিলো।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো সে যখন গাড়ি নিয়ে ফটকে প্রবেশ করছিলো তখন একটি ছায়ামূর্তি যেন সরে গিয়েছিলো পাশ থেকে। নূর বনহুরকে নিয়ে এত বেশি ভাবছিলো যে, হঠাৎ আসা সেই ছায়ামূর্তি তাকে বেশি আকৃষ্ট করতে পারেনি।

ভোরে শয্যা ত্যাগ করে বেলকুনিতে এসে দাঁড়াতেই দৃষ্টি তার চলে গেলো ফটকের পাশে হাস্নাহেনার ঝোপটার দিকে। কি যেন একটা পড়ে আছে সেখানে।

নূর মুহূর্ত বিলম্ব না করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচে এবং ফটকের দিকে অগ্রসর হলো।

মালিককে ব্যস্ততার সঙ্গে ফটকের দিকে অগ্রসর হতে দেখে বয়, বাবুর্চি, দারোয়ান সবাই বিস্মিত হলো। তারা অবাক হয়ে এ ওর মুখে তাকাতে লাগলো।

নূর ফটকের পাশে গিয়ে হাস্নাহেনার ঝোপটার দিকে তাকাতেই বিস্ময়ে থ' বনে গেলো। ঝোপটার আড়ালে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা লোক।

লোকটা মৃত বলেই মনে হচ্ছে।

নূর ডাকলো নিক্সন, নিক্সন।

ছুটে এলো ফটকের প্রহরী, কুর্ণিশ জানিয়ে একপাশে দাঁড়ালো।

নূর আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো হাস্নাহেনার ঝোপটার দিকে।

প্রহরী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—স্যার খুন।

নূর কিছু বলবার পূর্বেই আরও দু'জন পাহারাদার এবং অন্যান্য চাকর-বাকর এসে হাজির হলো।

নূর দ্রুত হলঘরে প্রবেশ করে রিসিভার তুলে নিলো এবং পুলিশ অফিসে জানিয়ে দিলো সংবাদটা।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে সাড়া পড়ে গেলো।

পুলিশ ডিটেকটিভ নুরুজ্জামান চৌধুরীর বাসভবনে খুন! রাতে দস্যু বনহুরের আবির্ভাব—এ সব যেন কেমন লাগছে। পুলিশ অফিসার মিঃ শফিউল এবং মিঃ জাহেদী গাড়ি নিয়ে ছুটে এলেন।

তাঁদের সঙ্গে এলো কয়েকজন পুলিশ।

হাস্নাহেনার ঝোপটার ভিতরে উবু হয়ে পড়ে থাকা লোকটাকে টেনে বের করে আনা হলো। লোকটা সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং তার পিঠে বিদ্ধ হয়ে আছে একটি তীরফলক।

নূর বললো—ঠিক এটা দস্যু বনহুরের কাজ। মিঃ জাহেদী বললেন—দস্যু বনহুর বেশ কিছুদিন নীরব থাকার পর আবার আগের রূপ ধারণ করলো। না জানি কে এই ব্যক্তি।

মিঃ শফিউল বললেন—ব্যাপারটা ক্রমেই গভীর রহস্যজালে ভরে উঠছে। এ ব্যক্তি কে আর কেনই বা এখানে এসেছিলো। আর তাকে কেনই বা হত্যা করা হলো।

নূর বললো—হাঁ, রহস্যপূর্ণই বটে কিন্তু এ রহস্য উদঘাটন করতে হবে।

মৃতদেহটিকে সনাক্ত করার চেষ্টা করা হলো।

কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারলো না এবং কি করে সে এখানে এলো তাও কেউ বলতে পারলো না, এমন কি পাহারাদার পর্যন্ত জানে না কখন এ ব্যক্তি ফটকের মধ্যে প্রবেশ করেছিলো।

লাশ মর্গে পাঠানো হলো।

তীরফলকটা নূর নিজের কাছে রাখলো।

তীরফলক নিয়ে পুলিশমহলে নানা গবেষণা চললো।

প্রথম দিন সিন্ধি সুড়ঙ্গপথে যে তীরফলক পেয়েছিলো, যা পুলিশবাহিনীর একজনের পিঠে বিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে, সেটা এবং এ তীরফলকটা একই রকমের, কাজেই দস্যু বনহুর ছাড়া অন্য কেউ নয়।

তীরফলক দুটি পুলিশের হেফাজতে না রেখে নূর নিজ বাসভবনে অতি সাবধানে রেখেছে। এই তীর নিক্ষেপকারীকে গ্রেপ্তার করতেই হবে।

পুলিশমহলে দস্যু বনহুরকে নিয়ে নানারকম আলাপ আলোচনা চললো। নানা ধরনের গবেষণা। তীরফলক দুটোই হলো তাদের এখনকার গবেষণার মূল সূত্র।

খবরটা একসময় চৌধুরীবাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো। কিন্তু সঠিক কিছু জানতে না পেরে সবাই খুব উদ্বিগ্ন হলো। নূরের ভবনে দস্যু বনহুর হানা দিয়েছিলো, এটা কানে যেতেই মনিরা উদ্বিগ্ন হলো। এ কথা কি সত্য তার স্বামী কান্দাই শহরে ফিরে এসেছে। একদিকে আনন্দ, একদিকে উদ্বিগ্নতা নূরের বাসভবনে কেন সে আবির্ভূত হলো, এটাই তার ভাবনার কারণ।

নূরকে ফোন না করে প্রতীক্ষা করতে লাগলো মনিরা সে কোনো সংবাদ দেয় কিনা।

মরিয়ম বেগম বলছিলেন—বৌমা, যা শুনলাম তা কি সত্য?

বলেছিলো মনিরা—সত্য বলেই তো সংবাদটা ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু নূরের সঙ্গে এইভাবে তার সাক্ষাৎ করাটা কি উচিত হলো মামীমা?

কি জানি মনির যেন দিন দিন আরও বেশি বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। কথাটা বললো মরিয়ম বেগম।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনে মধুর কণ্ঠস্বর—না মা, বেয়াড়া হইনি। তোমার ছেলে কোনোদিন বেয়াড়া হতে পারে না......

মনির বাবা মনির!

মা!

বনহুর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

মরিয়ম বেগম পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মনিরা তাকালো স্বামীর মুখের দিকে, অভিমানভরা তার দৃষ্টি। কত দিন পর স্বামীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। একটা অফুরন্ত আনন্দ-হিল্লোল বয়ে গেলো মনিরার দেহের শিরায় শিরায়।

কোনো কথা সে বললো না ঐ মুহূর্তে।

বনহুর মায়ের কোল ঘেঁষে বসলো, বললো—মা, কতদিন তোমার পাশে বসিনি।

মনির, যা শুনলাম সত্য?

কি মা?

তুই নূরের ওখানে গিয়েছিলি?

যদি বলি হাঁ।

কিন্তু কেন, কেন তুমি নূরের ওখানে গেলে? বললো মনিরা।

চুপ করো মনিরা—সব বলবো।

না, এক্ষুণি তোমাকে বলতে হবে। কথাটা বলে মনিরা এগিয়ে এলো স্বামীর পাশে।

মরিয়ম বেগম পুত্রের চিবুকে-বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। করুণ চোখে তাকিয়ে ছিলেন তিনি ওর মুখের দিকে। কতদিন বাছাকে তিনি দেখেননি, কাছে পাননি।

মরিয়ম বেগম সন্তানের চুলে হাত বুলান। বাবা মনির, এতদিন কোথায় ছিলি বাবা?

সে অনেক কথা, সব পরে বলবো।

বৌমা, ওর জামাকাপড় ছাড়তে দাও। আমি যাই, নাস্তা নিয়ে আসি।

চলে যান মরিয়ম বেগম।

বনহুর স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখে—মনিরা, তুমি সত্যি আমার উপর রাগ করেছো?

মনিরা অভিমানভরা সুরে বললো—না, রাগ করবো কেন? আজ কি ব্যাপারটা নতুন? কবেই বা আমি তোমাকে নিশ্চিন্ত মনে পাশে পেয়েছি। আচ্ছা বলো তো, এতদিন তুমি ডুব দিয়ে কোথায় ছিলে?

বলেছি তো সব বলবো, সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। তোমাদের সবাইকে বলবো। মনিরা, হয়তো আর কোনোদিন দেখা হতো না কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন, তাই তোমাদের মধ্যে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছি।

মনিরা অবাক হয়ে তাকালো স্বামীর মুখের দিকে।

বনহুর বলে চলেছে—যদি আর কোনোদিন ফিরে না আসতাম তাহলে তুমি কি আমার উপর রাগ করেই থাকতে? ক্ষমা করতে না তোমার স্বামীকে?

ওসব এখন থাক। স্বামীর জামার কলার চেপে ধরে বলে মনিরা—বলো, তুমি নূরের ওখানে কেন গিয়েছিলে? নিজেকে প্রকাশ করার আর জায়গা খুঁজে পাওনি?

বনহুর হেসে বললো—নূর তো বনহুরকে খুঁজে ফিরছে, তাই বনহুর গিয়েছিলো তাকে সাবধান করে দিতে। যেন সে অহেতুক সময় নষ্ট না করে....

সন্তানের সঙ্গে পিতার শুভ দর্শন অতি চমৎকার।

মনিরা!

জানি তুমি নিজ স্বভাব পাল্টাতে পারবে না কোনোদিন। তাই বলে তোমার লজ্জা করলো না ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে?

মনিরা, আমি যা চেয়েছিলাম তাই সে হয়েছে। দস্যু না হয়ে, হয়েছি ডিটেকটিভ। এতে আমার বড় আনন্দ কিন্তু সে আসল দুস্কৃতিকারী-স্মাগলারদের পিছু ধাওয়া না করে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার মিথ্যা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তুমিই বলো এতে তার সত্যিকারের কাজে বিঘ্ন ঘটছে কিনা?

মনিরা নীরব।

মরিয়ম বেগম মকবুলের হাতে স্তূপীকৃত নাস্তা নিয়ে হাজির হলেন সেখানে। মুখে তার শান্ত স্নিগ্ধ হাসির আভাস। কতদিন পর সন্তুনকে ফিরে পেয়েছেন তিনি। তাঁর প্রার্থনা আল্লাহতায়ালা কবুল করেছেন। তাঁর মনির অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে...

মরিয়ম বেগম পুত্রের সামনে খাবার রেখে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—নে বাবা, মুখে দে। কতদিন তোকে পাশে বসে খাওয়াইনি।

বনহুর খাবারের দিকে লক্ষ করে অবাক কণ্ঠে বললো—সর্বনাশ, মা এতকিছু তৈরি করেছো?

কথাটা বলেই খেতে শুরু করলো। খেতে খেতে বলে—মা, কতদিন তোমার হাতে খাইনি। সত্যি কত খেয়েছি কিন্তু তোমার মত কেউ খাবার তৈরি করতে পারে না।

খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যায়। সরকার সাহেব কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছেন।

ছুটে আসে ফুলির মা—বেগম সাহেবা, বেগম সাহেবা, ছোট সাহেব এসেছেন।

ফুলির মা নূরকে ছোট সাহেব বলে ডাকে, কাজেই বুঝতে কারও বাকি রইলো না নূর এসেছে।

একটু পূর্বে চৌধুরীবাড়ির সামনে গাড়ির শব্দ সবার কর্ণগোচর হয়েছিলো। এবার বুঝতে পারলো নূর এসেছে। মরিয়ম বেগম আর মনিরা একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো।

বললো মনিরা—নূর এসেছে।

বনহুর হেসে বললো—আমি জানি আজ সে এখানে আসবে।

তুমি জানতে নূর আসবে?

হাঁ জানতাম!

মরিয়ম বেগম বললেন—নূর ডিটেকটিভ হয়েছে। সমস্ত শহরে ওর কত নাম। যেদিন ও বিদেশ থেকে ফিরে এলো সেদিন পুলিশমহলে সেকি আনন্দ......

মা, আমি জানি নূর যেদিন ফিরে এলো সেদিন পুলিশমহল তাকে স্বাগতম জানাবেই, কারণ পুলিশমহল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চায়।

এমন সময় নূর দরজায় এসে উপস্থিত হলো।

পাশে তার সরকার সাহেব।

মরিয়ম বেগম বলে উঠলেন—নূর, তোর আব্বু এসেছে।

নূরের দৃষ্টি বনহুরের উপর পড়তেই তার মুখমন্ডল খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো। আনন্দ-উচ্ছসিত কণ্ঠে বললো নূর—আব্বু! ছোট হলে সে জড়িয়ে ধরতো আব্বুকে কিন্তু আজ যেন কেমন বাধলো তার কাছে। বনহুর নূরকে বুকে টেনে নিয়ে বললো—কেমন আছো নূর?

নূর বললো—ভাল আছি আব্বু কিন্তু তুমি এতদিন কোথায় ছিলে বলো তো?

বলেছি তো আমাকে এক এক সময় এক এক স্থানে থাকতে হয়। কাজেই সঠিক ঠিকানা দেওয়া মুস্কিল।

আব্বু, তুমি আর যেতে পারবে না। আর তোমাকে চাকরি করতে দেবো না। কত টাকা তোমার চাই, আমি তোমাকে দেবো।

নূর, টাকাটাই কি সবচেয়ে বড় জিনিস!

তাহলে কিসের প্রয়োজনে তুমি বিদেশ যাও?

নেশা।

আম্মী, দাদীআম্মী, এদের ছেড়ে বিদেশ থাকতে তোমার ভাল লাগে?

বনহুর কোনো জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো।

মনিরা বুঝতে পারলো স্বামী নূরের প্রশ্নে বিব্রত বোধ করছে, তাই প্রসঙ্গটা পাল্টে নেবার জন্য বললো—জানো আমাদের নূর এখন অনেক বড় ডিটেকটিভ হয়েছে।

শুনেছি, দোয়া করি যেন সফলকাম হয়। আমি হতভাগ্য পিতা, যখন নূর বিদেশ থেকে ফিরে এলো তখন আমি দূরে অনেক দূরে।

তবুও তো তোমার দোয়া ছিলো আব্বু! হাসতে হাসতে বললো নূর।

মরিয়ম বেগম এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সব শুনে যাচ্ছিলেন, তাঁর মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব একসঙ্গে ধাক্কা মারছিলো। না জানি পিতা-পুত্রের মিলন কেমন হবে। ক'দিন পূর্বেই নূর খেতে বসে গল্প করছিলো, দাদীআম্মী তুমি দেখে নিও আমি দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করবোই।

কথাটা আজ মরিয়ম বেগমের কানে বাজছিলো, প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো বারবার। না জানি হঠাৎ কোনো রকমে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়।

মরিয়ম বেগমকে চুপ থাকতে দেখে হেসে বললো নূর—দাদী আম্মী, তুমি ছেলেকে পেয়ে একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছো, ভুলে গেলে সবকিছু।

তুই নিজেও কম আনন্দিত হসনি, তোর চোখমুখই তার প্রমাণ দিচ্ছে। দাদু, তোর সঙ্গে আমিও আনন্দে আত্মহারা হয়েছি। যাক, তোরা গল্প কর, আমি ওদিকে দেখিগে।

না দাদীআম্মী, তুমি যাবে না, তুমি না থাকলে গল্প জমবে না ভাল। কথাটা বলে নূর দাদীর হাত ধরে বসিয়ে দিলো একটা সোফায়।

মনিরা স্বামী এবং পুত্রে মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

নূর বললো—আব্বু, তুমি এ সময় এসে ভালই করেছো। আমার জীবনে প্রথম অভিযান। জানো আব্বু, গত রাত স্বয়ং দস্যু বনহুর আমার শয়নকক্ষে হানা দিয়েছিলো।

মনিরা আর মরিয়ম বেগম মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

সরকার সাহেব নূরকে বেগম সাহেবার কক্ষে পৌঁছে দেবার পর তখনই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সেই কক্ষে ছিলেন শুধু মরিয়ম বেগম, মনিরা, নূর ও বনহুর।

ফুলির মাও নাস্তার ট্রে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

নূরের কথায় বনহুর কিছুমাত্র পরিবর্তিত হলো না। সে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—দস্যু বনহুর তোমার শয়নকক্ষে...

হ্যাঁ, একেবারে অবিশ্বাস্য আব্বু, আমি এই মুহূর্তে তোমার পরামর্শ কামনা করছি।

বনহুর কিছু বলবার পূর্বেই বলে উঠলেন মরিয়ম বেগম—নূর, ওসব কথা পরে হবে, আগে বাপ-ছেলে খেয়ে নে, কেমন?

বনহুর বললো—আমি অনেক খেয়েছি মা, তোমার নাতিকে এবার খাওয়াও।

আম্মু, তুমি জানো যেদিনই আসবো ঐদিনই দাদীআম্মী আমাকে এমনি করে নানা ধরনের খাবার খাইয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলবেন।

নূর, দাদীআম্মী তোমাকে খুব ভালবাসেন, তাইতো তোমাকে তিনি দৃষ্টির আড়ালে যেতে দিতে চান না। যাক্ এবার কিছু মুখে দাও।

আম্মু, তুমি খেয়েছো?

অনেক।

নূরের দিকে একটা প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলে মনিরা—নূর, খেয়ে নাও বাবা। পরে গল্প করো, কেমন?

আম্মী, কতদিন পর আব্বুকে পেয়েছি, আজ যে আমার পরম খুশির দিন। খাবার অনেক খেয়েছি, আরও খাবো......আব্বু, এবার বেশ কিছুদিন আছো তো?

যদি ডাক না আসে তাহলে থাকবো কয়েকদিন।

আব্বু, আমার নতুন বাসায় তোমাকে যেতে হবে কিন্তু।

বেশ তো যাবো।

মনিরা বললো—সে হবেক্ষণ, আগে বিশ্রাম করো।

মরিয়ম বেগম বললেন—সত্যি, আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে তা কি বলবো! মনির, নূর, আয় তোরা আমার দু'পাশে আয়, আমি বুকে নিয়ে বুক জুড়াই।

মায়ের কথা শুনে বনহুরের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। মাকে সে জীবনে কত ব্যথাই না দিয়েছে। আজ মায়ের ডাকে পাশে না এসে পারে না বনহুর।

মায়ের কোল ঘেঁষে একপাশে বসলো বনহুর, ডাকলো—নূর এসো।

নূর পিতার কথায় মৃদু হেসে দাদীমার অপর পাশে গিয়ে বসলো।

একপাশে সন্তান।

অপর পাশে নাতি।

মরিয়ম বেগম দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—আজ আমি সবচেয়ে বেশি সুখী। ওরে, তোরা এমনি করে আমার পাশে থাকতে পারিস না। এমিন করে আমার কোল জুড়ে......

বললে মনিরা—মামীমা শুধু সন্তান আর নাতিকে নিয়ে সুখী হতে চাও? আমি তোমার কেউ না?

বললেন মরিয়ম বেগম—পাগলী মেয়ে, তুই তো আমার মেয়ে। সব সময় তোকে কাছে কাছে রেখেছি। ওরা যে পালিয়ে যায়, তাই তো এত দুঃখ......

নূর হেসে বললো—আব্বু পালালেও আমি কিন্তু পালিয়ে যাই না। যখন ডাকো ঠিক তখনই এসে হাজির হই।

বনহুর বললো—মা, তুমি তো নূরকে পেয়েছো। এবার আমার অভাব আর তোমাকে তেমনভাবে দুঃখ দেবে না।

নূর বললো—দাদীআম্মী, তাই বলে তুমি আব্বুকে ছুটি দিও না। আব্বুকে এখন থেকে মাসে একটিবার...

নূরের কথার মাঝখানে বলে উঠে বনহুর—আসতেই হবে, কি বলো?

হাঁ আব্বু, নইলে আমি সোজা গিয়ে হাজির হবো তোমার আস্তানায়! নূর কথাটা বলে হাসতে লাগলো।

বনহুর মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলো একবার। সঙ্গে সঙ্গে নিজকে সামলে নিলো সবার অলক্ষ্যে।

কথাটা অবশ্য নূর হাল্কাভাবে বলেছে, সত্যি সে এত ভেবে চিন্তে বলেনি। মরিয়ম বেগম এবং মনিরার কানেও নূরের কথাটা কেমন যেন ধাক্কা মেরেছিলো।

বনহুর শান্তকণ্ঠে বললো—নূর, আমার অনেক দিনের ইচ্ছা যেখানে আমি কাজ করি একবার সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবো।

আব্বু, তুমি যখন ইচ্ছা পোষণ করেছো তখন যাবো। কারণ আমারও খুবই ইচ্ছা তুমি যেখানে থাকো সেখানে যাই...আম্মী, তোমাকেও আমি নিয়ে যাবো সঙ্গে করে, কেমন?

মনিরা কোনো জবাব দিলো না।

মরিয়ম বেগম বললেন—যা বাছা, এবার তোরা জামাকাপড় ছেড়ে বিশ্রাম কর্‌গে, যা।

নূর বলে উঠলো—আজ বেশিক্ষণ দেরী করতে পারবো না। জানো আম্মী, আজ হন্তদন্ত হয়ে কেন ছুটে এসেছিলাম।

ঐ তো বললি স্বয়ং দস্যু বনহুর নাকি তোর শয়নকক্ষে হাজির হয়েছিলো।

হাঁ আম্মী, এত সাহস দস্যু বনহুরের যে, আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে আমাকে শাসায়।

মরিয়ম বেগম কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ঐ মুহূর্তে মনিরা বললো—মামীমা দস্যু বনহুরকে নিয়ে নূরের বড় চিন্তা ছিলো, তাই সে দেখা দিয়ে গেছে। এতে সাহসের কি দেখলে বাবা!

আম্মী, তুমি জানো না আমার কক্ষের চারপাশে কারেন্ট সংযুক্ত করা আছে। দস্যু বনহুরের ভাগ্য যে সে জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে গেছে।

মরিয়ম বেগম বললেন—দস্যু বনহুর হলেও তো সে মানুষ।

নূর এবার রাগত কণ্ঠে বললো—কাকে তুমি মানুষ বলছো দাদীআম্মী! সে যদি মানুষ হতো তাহলে দেশের জনগণের সর্বনাশ করতো না। মানুষকে সে হত্যা করতো না। জানো আব্বু, গত রাত্রে দস্যু বনহুর শুধু আমার বাসভবনে হানাই দেয়নি, সে হত্যা করেছে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—অজ্ঞাত ব্যক্তি! কেনো অজ্ঞাত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে?

আব্বু, তুমি জানো না, আমি তোমাকে সব বলছি শোনো। আমি বসে বসে ডায়রী লিখছিলাম। রাত তখন তিনটে হবে।

এত রাত তুমি জেগেছিলে নূর? বললো বনহুর।

হাঁ, আমাকে জেগে থাকতে হয়, কারণ অনেক রাত ধরে আমি আমার কার্যাবলি নিয়ে গবেষণা করি। তাছাড়া ঘুম আসে না আমার চোখে।

নূরের কথায় বলে উঠেন মরিয়ম বেগম—রাত জাগা মোটেই ভাল নয় নূর। এতে অসুখ বিসুখ হবার সম্ভাবনা।

মনিরা বলে উঠলো—হাঁ, ঠিক বলেছো মামীমা, বেশি রাত জাগলে শরীর নষ্ট হয়।

নূর হেসে বললো—ঐ কারণেই তো তোমাদের কিছু বলি না। আব্বু আমার সব কথা বুঝবেন, তিনি কোনোদিন আমার কাজে বাধা দেবেন না। আব্বু, জানেন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারলে আমি জয়ী হবো। শুধু কান্দাই শহরেই নয়, সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে আমার নাম......

মরিয়ম বেগম স্তব্ধ হয়ে শুনছেন, মুখমন্ডল তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। ঢোক গিলছেন তিনি বারবার।

মনিরা বলে উঠলো—দস্যু বনহুর তোর কি ক্ষতি করেছে?

আম্মী, তুমি প্রায়ই এ কথা বলো। আমার ক্ষতি সাধন বা অন্যায় সে না করলেও দেশের ক্ষতি সাধন, অন্যায় সে করছে। তার অসাধ্য কিছু নেই। আম্মী, জ্ঞান হবার পর থেকেই আমি এই দস্যুর নাম শুনে আসছি। পুলিশমহল হিমসিম খেয়ে গেছে, তাকে কেউ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কিন্তু দেখো, সে যতবড় দস্যুই হোক আমি তাকে গ্রেপ্তার করবোই।

মনিরা পুনরায় বললো—শুধু সুনাম নয় নূর, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারলে পাবি দু'লক্ষ টাকা।

নূর হেসে বললো—টাকার মায়া আমার নেই। যাক ও সব কথা, শোনো আব্বু যা বলছিলাম।

বনহুর একটা সোফায় হেলান দিয়ে শুনে যাচ্ছিলো, কোনো কথা সে বলছিলো না।

নূর বলে চলেছে—আমি ডায়রী লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় পেছনে কারও উপস্থিত অনুভব করলাম। ফিরে তাকাতেই দেখলাম জমকালো পোশাকপরা এক ব্যক্তি।

বললো বনহুর—তারপর?

মুখখানা তার কালো পাগড়ির আঁচলে ঢাকা। শুধু চোখ দুটো নজরে পড়ছিলো। বৈদ্যুতিক আলোতে চোখ দুটো মনে হচ্ছিলো যেন আগুনের টুকরো।

এত কাছে পেয়েও তুমি তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলে না নূর?

আমি তখন অপ্রস্তুত ছিলাম। নইলে ওকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও জখম না করে ছাড়তাম না। আব্বু, সে আমাকে শাসিয়ে গেলো, আমি যেন তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা না করি। হাসলো নূর, হাসি থামিয়ে বললো—বনহুরের কথায় আমি মোটেই ভয় পাইনি। ও চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মনিরা বলে উঠলো—এত দুঃসাহস ভাল নয় নূর।

আম্মী, তোমরা নারীজাতি—দুর্বল মন তোমাদের, তাই তো তোমাদের কাছে সব কথা বলতে চাই না। শোনো, তারপর কি ঘটলো আমি অশ্বপদশব্দ লক্ষ্য করে গাড়ি চালালাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত অশ্বপদশব্দ ক্ষীণ হতে

ক্ষীণতর হয়ে এলো। আমি ফিরে এলাম। রাত তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

তারপর? বনহুরের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

বললো নূর—আমি যখন গাড়ি নিয়ে ফটকের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আমার মনে হলো ফটকের পাশে হাস্নাহেনার ঝোপটার মধ্যে কেউ যেন আত্মগোপন করলো। তখন আমি বনহুরের চিন্তায় এত বেশি উত্তেজিত ছিলাম যার জন্য ওসব নিয়ে ভাববার সময় আমার ছিলোনা।

তুমি একটিবার খোঁজ করে নিয়ে দেখলে না বা কাউকে খোঁজ করতে বললে না? বললো বনহুর।

মরিয়ম বেগম যেন একেবারে বোবা বনে গেছেন। নূরের কথাগুলো তাঁর মনে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি করছিলো। তিনি নিজকে অতিকষ্টে সংযত রেখে শুনে যাচ্ছিলেন ওদের কথাবার্তা। বয়স হয়েছে, কি বলতে কি বলবেন তার ঠিক নেই, তাই তিনি নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন।

মনিরা কিন্তু মাঝে-মধ্যে জবাব না দিয়ে পারছে না।

নূর বললো—হয়তো এটা আমার ভুল হয়েছে।

বললো বনহুর—ভুল নয়, একেবারে মারাত্মক ভুল তুমি করেছিলে নূর। ঐ মুহূর্তে গাড়ি রেখে তোমার দেখা উচিত ছিলো। তাছাড়া প্রহরী যখন ছিলো তখন কোনো অসুবিধাই হতো না। বলো তারপর?

তারপর বাকী রাতটুকু আমার ঘুম হলো না। খুব সকালে উঠে সোজা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। যেখান থেকে ফটকের পাশে হাস্নাহেনার ঝোপটা স্পষ্ট নজরে আসবে। ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেই আমার দৃষ্টিতে পড়লো হাস্নাহেনার ঝোপটার মধ্যে সাদা কোনো একটা বস্তু পড়ে আছে। নিজে গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। আমার পেছনে প্রহরী এবং কয়েকজন চাকর-বাকর গিয়ে উপস্থিত হলো। দেখলাম একটা লোক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে হাস্নাহেনা ঝোপটার মধ্যে।

বনহুর গভীর আগ্রহে সোজা হয়ে বসে বললো—তারপর কি দেখলে?

দেখলাম লোকটার পিঠে একটা তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। লোকটা মৃত্যু বরণ করেছে বহুপূর্বে...

আশ্চর্য! অস্ফুট স্বরে বললো বনহুর।

মনিরা তাকালো স্বামীর মুখের দিকে।

নূর বলে চলেছে—শুধু আশ্চর্য নয় আব্বু, একেবারে মর্মান্তিক। দস্যু বনহুর আমাকে হত্যা না করে আর একজনকে হত্যা করে রেখে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছে সে কত নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর। ইচ্ছে করলে সে আমাকেও খুন করতে পারে, এটাই বুঝাতে চায়।

তীরবিদ্ধ মৃতদেহটিকে তোমরা সনাক্ত করতে পারোনি?

না।

বনহুর খুব গম্ভীর হয়ে পড়লো।

নূর বলে চলেছে—আব্বু, যে তীর নিহত ব্যক্তির পিঠ থেকে আমরা উদ্ধার করলাম ঠিক ঐ রকম তীরফলকই আমরা উদ্ধার করেছি সিন্ধী সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করার সময় নিহত পুলিশের পিঠ থেকে। কাজেই ঐ দুই তীর নিক্ষেপকারী একই ব্যক্তি এবং সে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করতেই মায়ের মুখে দৃষ্টি পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট কেসটা পূর্বস্থানে রেখে সোজা হয়ে বসলো।

মরিয়ম বেগম বুঝতে পারলেন, তিনি বললেন—তোমরা কথা বলো, আমি আসছি।

বেরিয়ে গেলেন মরিয়ম বেগম।

ঐ সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

বনহুর রিসিভার মুখে হাত রেখে বললো—নূর, তোমার টেলিফোন।

নূর উঠে গিয়ে রিসিভার ধরলো।

তারপর কথা শেষ করে ব্যস্ততার সঙ্গে বললো—আমার ডাক এসেছে, এক্ষুণি যেতে হবে।

কথাটা বলে নূর তাকালো মায়ের মুখের দিকে।

মনিরা বললো—এক্ষুণি যাবি?

হ্যাঁ আম্মী, পুলিশ অফিসে জরুরি কাজ আছে আমার জন্য সেখানে কয়েকজন পুলিশ অফিসার অপেক্ষা করছেন আব্বু চলি। আবার আসবো, তুমি যেন যেও না।

বনহুর হেসে বললো—আমাকেও যেতে হবে। কারণ অনেক কাজ আছে আমার হাতে। তবে দেখা হবে আবার।

নূর বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

বনহুর মনিরার হাতখানা মুঠায় তুলে নিয়ে বললো শুনলে তোমার ছেলের কথাগুলো?

শুনলাম। সত্যি। ওকে আমি কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। তুমি বুঝবেনা কি অসহ্য চিন্তায় আমি আছি......

কেন বলো তো? কিসের চিন্তা তোমার?

নূর যেদিন থেকে শপথ গ্রহণ করেছে দস্যু বনহুরকে সে গ্রেফতার করবো সেদিন থেকে আমি কি যে অশান্তি বুকে চেপে আছি কি বলবো। সন্তান হয়ে পিতার প্রতি......

চুপ করো মনিরা, ও কথা তুমি কোনো সময় মুখে এনো না। মনির চৌধুরীর পুত্র নুরুজ্জামান চৌধুরী—বনহুরের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই।

ওগো, তুমি বুঝবে না।

মনিরা!

যদি কোনোদিন নূর জানতে পারে স্বয়ং দস্যু বনহুর তার পিতা......

তুমি সে জন্য ভেবো না মনিরা। এসো, সরে এসো আমার কাছে। বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো।

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বললো—ছিঃ এত বয়স হলো তবু তোমার দুষ্টামি গেলো না। ছাড়ো, কেউ এসে পড়বে।

কিছুতেই মনিরা বনহুরের বাহুবন্ধন শিথিল করতে পারলো না।

❑

জাভেদ আমি জানতাম তুমি ঠিক আমার নির্দেশমত কাজ করতে পারবে। এ ভরসা আমার ছিলো।

জাভেদ তীর-ধনুটায় নতুন ছিলা পরাতে পরাতে বললো—তোমার আশীর্বাদ আমার পাথেয়। আশা আম্মু, লোকটা যখন হাস্নাহেনা ঝোপটার মধ্য থেকে বের হতে যাচ্ছিলো, আমি সেই মুহূর্তে তাকে তীরবিদ্ধ করেছিলাম।

উপযুক্ত সাজা সে পেয়েছে। লোকটার উদ্দেশ্য সফল হলো না।

আশা আম্মু, লোকটা ডিটেকটিভ নুরুজ্জামানকে হত্যা করলে আমাদের এমন কি ক্ষতি হতো আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না।

সব জানতে পারবে একদিন। শোনো জাভেদ, যে লোকটাকে তুমি তীরবিদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলে, তার পরিচয় আজ বলবো। কান্দাই শহরের সবচেয়ে বড় দুষ্কৃতিকারীর দলের সে ছিলো একজন।

জাভেদ তীক্ষ্ণদৃষ্টি তুলে ধরলো আশার মুখের দিকে।

আশা বললো—কান্দাই শহরে কোনো এক গোপন স্থানে তাদের আস্তানা রয়েছে। সেখানে তারা নানা ধরনের কুকর্ম করে চলেছে। নুরুজ্জামান এদের দলের সন্ধানে আছে এবং আমার মনে হয় সে অচিরেই এদের খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে।

জাভেদের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো—স্মাগলার দল ওরা!

হাঁ জাভেদ, ঐ লোকটা স্মাগলার দলের লোক ছিলো। আশা কথাটা বলে কোমরের বেল্ট ঠিক করতে থাকে। তারপর আপন মনে বলে আশা—শুধু হীরাপর্বতই আমার আয়ত্তে নয়, সমস্ত হীরা নগরীই আমার হাতের মুঠায়, বুঝলে জাভেদ!

আমি তোমার মুখে সব শুনেছি এবং তোমার সঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছি।

না, এখনও অনেক কিছু তোমার জানবার বাকী আছে জাভেদ। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও, এক্ষুণি রওনা দেবো।

কোথায় যাবে?

হীরা পর্বতমালার অদূরে রঘু নামে এক ডাকাত আস্তানা গেড়েছে। আমার রাজ্যে রঘু ডাকাত বিচরণ করে ফিরবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

জাভেদ বললো—এ কথা এতদিন আমাকে বলোনি কেন আশা আম্মু?

আগে বলার সময় হয়নি। এখন সময় এসেছে, তাই বললাম।

রঘু ডাকাতের আবির্ভাব তাহলে বেশি দিনের নয়, কি বলো?

বেশিদিন বলতে তুমি কতদিন বলতে চাও জাভেদ?

ধরো বছরখানেক?

না, সে পাঁচ বছর হলো আমার হীরা পর্বতের কোনো এক স্থানে গোপন আস্তানা গেড়ে নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। জাভেদ, রঘু ডাকাতের অত্যাচারে হীরা নগরী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। হীরা পর্বতের পাশ দিয়ে কোনো পথিক পথ চলতে পারে না।

এ কথা আমার কানেও গেছে আশা আম্মু, কিন্তু

কোনো কিন্তু আর নয়—আমি এক্ষুণি রঘু ডাকুর সঙ্গে মোকাবেলা করতে যাবো, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

জাভেদ বললো—আচ্ছা।

একটু পর আশা দুটো অশ্ব নিয়ে হাজির হলো সেখানে।

একটিতে চেপে বসলো আশা, অপরটিতে জাভেদ।

অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসার সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব দুটি সামনের পা উঁচু করে চিঁ হিঁ চিঁ হিঁ শব্দ করে উঠলো।

তারপর উল্কা বেগে ছুটে চললো আশা আর জাভেদের অশ্ব।

শুধু পাথুরিয়া মাটিতে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো খট্ খট্ খট্ খট্ খট্ খট্ আওয়াজ। আশার সমস্ত শরীরে আটসাট পোশাক, প্যান্ট শার্ট, গলায় রুমাল বাঁধা।

জাভেদের দেহের পোশাকও ঠিক ঐ ধরনের।

কতকটা বনহুরের ড্রেসের মতই জাভেদের ড্রেস। মাথায় পাগড়ি, পাগড়ির আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। পিঠের সঙ্গে তীর-ধনু বাঁধা, কানে বালা।

এ ড্রেসে অদ্ভুত সুন্দর লাগে ওকে।

আশার শরীরেও একই ধরনের পোশাক। কোমরের একপাশে রিভলভার অপর পাশে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

অবশ্য জাভেদের কোমরেও রিভলভার এবং অপর পাশে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা রয়েছে। ডান কাঁধে ঝুলছে তার দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

আশার অশ্ব আগে ছুটে চলেছে।

পেছনে জাভেদের অশ্ব।

বন জঙ্গল, উঁচুনীচু জলাভূমি সব ছাড়িয়ে অশ্ব দুটি ছুটে চলেছে।

বহুক্ষণ চলার পর হীরাপর্বতের পাদদেশে যেয়ে পৌছলো তারা দু'জন।

অশ্ব দুটি থেমে পড়লো।

এবার পর্বতের গা বেয়ে উপরে উঠার পালা।

কিছুটা ঢালু হয়ে তারপর বেশ খাড়া পর্বত। আশা অশ্ব নিয়ে উপরে উঠতে লাগলো। জাভেদ তাকে অনুসরণ করছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে ললাটে।

আশা নারী হলেও তার এ সব সহ্য হয়ে গেছে। জাভেদের এ পথ নতুন। খাড়া পর্বত বেয়ে অশ্ব নিয়ে উপরে উঠতে বেশ হাঁপিয়ে পড়ছিলো

সে। তাছাড়া বয়সেও তরুণ। তবু ক্ষান্ত হবার বান্দা নয় জাভেদ, অশ্ব বল্গা চেপে ধরে আছে সে মজবুত করে।

আশা আর জাভেদ বেশ কিছু উপরে উঠতেই একটা বিরাট ফাটল পেলো সামনে। খাড়া পর্বতমালাকে যেন ফাটলটা দ্বিখন্ডিত করে দিয়েছে।

আশার আর জাভেদের অশ্ব ফাটলের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো।

আশা বললো—জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়তে হবে, কারণ ওপারে যেতে হলে পর্বতের গা বেয়ে নিচে নামতে হবে, তারপর উঠতে হবে উপরে, একদম ওপাশে।

কথাটা বলে অশ্ব থেকে নেমে পড়লো আশা।

জাভেদও অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো।

জাভেদের মুখে দীপ্ত ভাব। আজ সে নিজকে নতুনভাবে যেন আবিষ্কার করলো। অসাধ্য সাধন করতে যাচ্ছে যেন সে।

আশা আর জাভেদ অশ্ব দুটোকে ছেড়ে ঠিক ফাটলের উপরে গিয়ে দাঁড়ালো, নিচে গভীর খাদ।

কতকগুলো অজানা বৃক্ষ ফাটলের গা বেয়ে উপরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে গেছে। শিকড়গুলো ঝুলছে নিচের দিকে।

আশা বললো—শিকড় ধরে নিচে নামতে হবে, তারপর ওপাশে গিয়ে পৌছবো।

আশা শিকড় ধরে ঝুলে পড়লো।

তারপর নামতে লাগলে নিচের দিকে।

জাভেদও নামছে ঠিক আশার মতই করে। একটু নামতেই অপর একটি শিকড় সামনে ঝুলছে দেখতে পেলো।

আশা বললো—ওটা ধরে ঝুলে পড়ো।

জাভেদ ঝুলে পড়লো এবং এক লাফে ওপাশে গিয়ে ধরে ফেললো ওদিকের গাছের একটা শিকড়।

আশাও এসে পৌছে গেলো।

আশা আনন্দসূচক শব্দ করে বললো—সাবাস। জাভেদ তুমি ঠিক তোমার বাবার মতই দুঃসাহসী হয়েছো।

জাভেদ শুধু হাসলো।

এবার আশা আর জাভেদ মিলে পর্বতে দেয়াল বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে চললো।

যদিও বেশ কষ্ট হলো তবু বেশিক্ষণ সময় লাগলো না আশা আর জাভেদ উঠে এলো ওপাশে।

ঘোড়াগুলো এপাশে ঘাস খেতে শুরু করে দিয়েছে।

আশা আর জাভেদ সোজা উপরে উঠে ঝোপঝাড় আগাছা জঙ্গলে আত্নগোপন করে এগুতে লাগলো।

আশা নিজ হাতে তুলে নিলো রিভলভারখানা। দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা বাম হাতের মুঠোয়।

আশা জাভেকে লক্ষ্য করে বললো—জাভেদ হঠাৎ কোনো বিপদ এসে পড়তে পারে, কাজেই প্রস্তুত থেকো। তুমিও রিভলভার খুলে নাও হাতে।

জাভেদ নিজ কোমরের বেল্ট থেকে খুলে নিলো রিভলভারখানা। তারপর সতর্কতার সঙ্গে এগুতে লাগলো।

আশা কিছুদূর গিয়ে একটা উঁচুটিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লো। সেখান থেকে দূরে একটি সমতলভূমি পরিলক্ষিত হলো। আশা চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে কিছুক্ষণ দেখলো, তারপর বললো—জাভেদ দেখো, ঐ যে দূরে সমতলভূমি পরিলক্ষিত হচ্ছে, ওখানে পাশেই পর্বতের গায়ে বিরাট একটি গুহামুখ দেখা যাচ্ছে........

জাভেদ আশার হাত থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা নিয়ে চোখে লাগিয়ে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, একটা গুহামুখ তার নজরে পড়লো। দূরবীক্ষণ যন্ত্র থেকে চোখ না সরাতেই জাভেদ দেখলো কয়েকটা লোক অশ্বপৃষ্ঠে চেপে সেই সমতলভূমিতে এসে দাঁড়ালো।

জাভেদ দূরবীক্ষণে চোখ রেখেই বললো—কয়েকজন লোক অশ্বপৃষ্ঠে এসে দাঁড়ালো গুহামুখে। কিন্তু তাদের একজনের অশ্বপৃষ্ঠে হাত পিছমোড়া করে বাঁধা এক তরুণী।

দেখি? দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা হাতে নিয়ে আশা তাতে চোখ রাখলো, সত্যিই কয়েকজন নরপশু একটি তরুণীকে পিছমোড়া করে বেঁধে ধরে এনেছে। লোকগুলো অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো।

তরুণীটির দেহে অদ্ভুত পোশাক।

মাথায় ঘন কালো চুল, ছড়িয়ে পড়েছে তার চোখেমুখে।

তরুণীটিকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামানোর পর তার হাত দু'খানা মুক্ত করে দেওয়া হলো।

জাভেদ বললো—আমি খালি চোখেও ভাল দেখতে পাচ্ছি। তীর সংযোগ করলো জাভেদ তার ধনুতে। বললো—আমি এক্ষুণি ওদের তীরবিদ্ধ করবো।

আশা ডান হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা চোখে রেখে বাম হাতে জাভেদের ধনু নামিয়ে দিয়ে বলে—সাবধান, হঠাৎ ভুল করে বসো না জাভেদ। তীর ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সরে পড়বে। আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

জাভেদ বললো—ওরা কারা?

আশা বললো—রঘু ডাকুর দল। ঐ দেখো তরুণীটাকে ওরা দু'জন লোক টেনেহিঁচড়ে গুহার মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

কাজেই আমাকে তীর ছোড়ার অনুমতি দাও আশা আম্মু।

ধৈর্য ধরো, বেশি উত্তেজিত হয়ো না জাভেদ।

দেখছো আশা আম্মু, তরুণীটাকে কি ভাবে ওরা হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ওদের মধ্যে কি রঘু ডাকু আছে?

আশা বললো—রঘু ডাকু এত সহজে বাইরে আসবে না। সে আসল জায়গায় আছে।

আশা আম্মু, তুমি অনুমতি দাও—আমি যাবো ঐ স্থানে।

জাভেদ, তোমার মনোবলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু এত শীঘ্র তোমাকে ওখানে যেতে দেবো না।

কিন্তু ঐ তরুণীটিকে যে উদ্ধার করা একান্ত দরকার?

হাঁ, জাভেদ।

আশা আম্মু, তুমি যাই বলো আমি ওখানে যাবো।

আশা তখন দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখছিলো। অশ্বারোহী লোকগুলো তরুণীটিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গুহায় প্রবেশ করলো। একটু পর বেরিয়ে এলো সবাই, তারপর অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

তরুণীটিকে আর দেখা গেলো না।

বললো আশা—রঘু ডাকু এই গোপন স্থানে আত্মগোপন করে যত কু'কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। জাভেদ, আমি ওর আস্তানা তোমাকে দেখালাম, কারণ প্রয়োজন হলে তোমাকে একাই আসতে হবে এবং রঘু ডাকাতের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে।

আমি প্রস্তুত আছি আশা আম্মু।

আশা জাভেদের কথা শুনে খুশি হলো।

ততক্ষণে অশ্বারোহিগণ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। আশা আর জাভেদ তখন এগুতে লাগলো। পর্বতমালার গা বেয়ে বেয়ে এগুতে লাগলো ওরা।

একটু ফাঁক পেলে সেইটুকু পথ দ্রুত দৌড়ে গিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে আত্নগোপন করে এগিয়ে চললো। কেউ যেন ওদের দেখতে না পায়।

বেশ সময় লাগলো আশা আর জাভেদের সেই সমতল স্থানে পৌঁছতে। কতকগুলো অশ্ব পদচিহ্ন রয়েছে। পর্বতের গায়ে মস্ত গুহামুখ।

আশা আর জাভেদ গুহার মধ্যে প্রবেশ করবে কিনা ভাবছে, ঐ মুহূর্তে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেলো।

আশা ও জাভেদ থমকে দাঁড়ালো।

আশা বললো—গুহায় প্রবেশ করার আর কোনো পথ আছে কিনা দেখতে হবে।

ওরা আবার গুহার পিঠ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। স্থানে স্থানে ভীষণ খাড়া এবং পিচ্ছিল। কোনো কোনো জায়গায় ফাটল রয়েছে।

আশা সর্বক্ষণ সতর্ক যেন জাভেদ ফাটলের মধ্যে পড়ে না যায়। কখনও ওর হাত ধরে এগিয়ে নিচ্ছিলো।

জাভেদ হেসে বলে উঠলো—আশা আম্মু, তুমি আমাকে কচি খোকা মনে করেছো, তাই ভয় পাচ্ছো এত।

জাভেদ তোমাকে ঠিক তোমার বাবার মত করেই গড়ে তুলবে, তাইতো তোমাকে আমি তোমার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে এনেছি। তোমার মা তোমাকে সব সময় কাছে কাছে আগলে রেখে তোমার মধ্যে যে ঘুমন্ত সিংহপ্রাণ আছে তাকে জাগতে দেবে না। আমি চাই তুমি সত্যিকারের সিংহপ্রাণ ব্যক্তি হও....

তোমার আশীর্বাদ আমার পাথেয়। বললো জাভেদ।

আরও কিছুটা উপরে উঠার পর হঠাৎ তাদের কানে গেলো ক্ষীণ আর্তনাদের শব্দ।

চমকে উঠলো আশা এবং জাভেদ।

সামনে একটা ফাটল।

জাভেদ বললো—আশা আম্মু, এসো এসো ঐ ফাটলের মধ্যে হতে আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছে! কথাটা বলে জাভেদ ফাটলের মধ্যে নেমে পড়লো।

আশাও নেমে এলো ফাটলের মধ্যে। একটা গর্তের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গুহাটা, যার ভিতর থেকে আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছে।

জাভেদ চাপাকণ্ঠে বললো—আশা আম্মু, দেখো গুহাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আশাও এসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ফাটলের মধ্যে। একটি গুহার ভিতরে মশাল জ্বলছে। একপাশে লৌহ খাঁচায় একটি তরুণী চেহারার লোক, হাতে তাদের লৌহশলাকা। সমানে আরও একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার নির্দেশমত লৌহশলাকা অগ্নিদগ্ধ করে লোক দুজন তরুণীর হাতে এবং পায়ে লাগাচ্ছে। তীব্র যন্ত্রণায় মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠছে। সে কী ভীষণ দৃশ্য।

আশা আর জাভেদ বিস্ময় নিয়ে দেখছিলো।

আশা বললো—জাভেদ, ঐ তৃতীয় ব্যক্তি যে লৌহশলাকাধারীদ্বয়কে নির্দেশ দিচ্ছে সেই হলো রঘু ডাকু।

জাভেদ বললো—যে তরুণীটিকে তখন আনা হলো এ সেই মেয়ে......

ঐ মুহূর্তে পুনরায় লৌহশলাকা তরুণীর হাতে লাগিয়ে দেয়। তরুণী আর্তনাদ করে উঠলো, আঃ বাঁচাও বাঁচাও।

জাভেদ ধনুতে তীর সংযোগ করে বললো—আমি এক্ষুণি খতম করে দি....

কাকে?

ঐ যারা লৌহশলাকা অগ্নিদগ্ধ করে মেয়েটির দেহে লাগাচ্ছে ..

না, পারবে না।

কেন? কেন পারবো না?

এখান থেকে তীরবিদ্ধ করা সম্ভব হবে না জাভেদ। বরং ওরা সতর্ক হয়ে আছে ওরা বুঝতে পারবে কেউ তাদের আস্তানার খবর পেয়েছে।

ওরা কি মনে করে তাদের আস্তার সন্ধান কেউ জানে না?

হাঁ, তাই মনে করে এবং সে সুযোগ নিয়েই তোমাকে কাজ করতে হবে। মেয়েটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা তোমাকে করতে হবে জাভেদ।

জাভেদ মাথা নত করে বললো—রাজি আছি আশা আম্মু!

সাবাস!

গুহার ভিতর থেকে ঐ মুহূর্তে ভেসে আসে তীব্র আর্তনাদের শব্দ।

আশা দু হাতে কান চেপে ধরে।

ডান কাঁধে তার দূরবীক্ষণ যন্ত্র ঝুলছে, কোমরের বেল্টে এক পাশে রিভলভার অপর পাশে সূতীক্ষ্ণধার ছোরা।

জাভেদ অধর দংশন করলো, তার মুখমন্ডলে একটা যন্ত্রণার ছাপ পরিস্ফুটিত হয়ে উঠলো।

আশা বললো—আজ ফিরে যেতে হবে জাভেদ।

তাহলে মেয়েটি মারা পড়বে যে!

উপায় নেই। সময়ের দরকার, বুঝলে জাভেদ।

জাভেদ আর আশা যেভাবে এসেছিলো সেইভাবে ফিরে চললো।

জাভেদের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। যেমন করে হউক রঘু ডাকাতকে সায়েস্তা করতেই হবে।

❑

হীরা নগরীর প্রেসিডেন্ট কন্যা মিস মিনারা মির্জা হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ায় সমস্ত নগরীতে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সবার মুখে ঐ একই কথা, প্রেসিডেন্ট কন্যা নিখোঁজ হয়েছে। কোথায় গেলো? কে তাকে চুরি করলো? কার এত সাহস?

শুধু নগরেই নয়, গ্রামে গ্রামে, বন্দরে বন্দরে হোটেল রেষ্টুরেন্টে, পথেঘাটে, মাঠে, এমন কি সিনেমা হলেও ঐ একই কথা প্রেসিডেন্ট কন্যা উধাও হয়েছে—কে বা কারা তাকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্টের স্ত্রী কন্যা শোকে সংজ্ঞাহীন অবস্থা।

এ ব্যাপার নিয়ে পুলিশমহল ছাড়াও নগরীর প্রতিটা ব্যক্তি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। চারিদিকে সন্ধান আর সন্ধান।

এমন দিনে একটা চিঠি পেলেন প্রেসিডেন্ট মির্জা সিংহা। চিঠিখানায় লেখা আছে—যদি কন্যাকে ফেরত পেতে চান তাহলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সোনা দিতে হবে এবং সেই সোনা হীরা পর্বতের এক নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদি কোনো সতর্কতার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে

ডিনামাইট ব্যবহার করা হবে এবং মিস মিনারা মির্জাকে সে ডিনামাইটের শিকার করা হবে।

এ চিঠি প্রেসিডেন্ট মির্জা সিংহাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। পুলিশমহল থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রেসিডেন্ট ভবনে এসে সমবেত হচ্ছেন এবং নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা চলছে।

নানা ধরনের মোটর গাড়িতে ভরে উঠেছে প্রেসিডেন্ট ভবনের সম্মুখ ভাগ।

সবার মুখে শোকের ছায়া।

এমন কি হীরা নগরীর মিলিটারী বাহিনীতেও সাড়া পড়ে গেছে। ক্যাপ্টেন, মেজর, ব্রিগেডিয়ার সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

এ কেমন কথা, প্রেসিডেন্ট কন্যা নিখোঁজ হলো অথচ তাঁরা তার কোনো হদিস করতে পারলেন না। এ চিঠি নিয়েও সব অফিসারের মধ্যে আলোচনা চলছে।

পঞ্চাশ লক্ষ টাকার স্বর্ণ—কম কথা নয়!

এ ব্যাপার নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতেও ভয় পাচ্ছেন সবাই। প্রেসিডেন্ট বিমর্ষভাবে বলেছেন তাঁর প্রাণ সমতুল্যা কন্যা এখন দুষ্কৃতিকারীদের হাতে রয়েছে, কাজেই অতি সাবধানে সংযত অবস্থায় কথাবার্তা চালানো দরকার। কোনো কারণে যদি তারা তাঁদের কন্যাকে হত্যা করে বসে তাহলে প্রেসিডেন্ট স্ত্রী এ মুহূর্তে হার্টফেল করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রেসিডেন্ট মিঃ মির্জার অবস্থাও তাই।

কন্যাশোকে পাগলপ্রায় তিনি। একমাত্র কন্যা মিস্ মিনারা মির্জার অন্তর্ধান তাঁকে একেবারে মুষড়ে দিয়েছে। তিনি ঐ মূল্যের স্বর্ণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

❑

পঞ্চাশ লক্ষ টাকার স্বর্ণ দাবি করেছে!

হাঁ সর্দার।

রহমান, এ সংবাদ তোমাকে কে জানিয়েছে?

হীরা নগরীতে আমাদের যে অনুচর আছে সেই জানিয়েছে। এমনকি হীরা নগরীর সংবাদপত্রের একটি কপিও সে পাঠিয়েছে।

কোথায় সে সংবাদপত্রখানা?

রহমান তাকালো মংলুর দিকে সংবাদপত্রটা নিয়ে এসো।

মংলু চলে গেলো।

বনহুর শয্যায় অর্ধ শায়িত অবস্থায় ছিলো, এবার সোজা হয়ে বসলো— রহমান, কান্দাই থেকে হীরা নগরী তিন দিনের পথ।

শুধু তাই নয় সর্দার, অশ্বপৃষ্ঠে রওনা দিলে পাঁচ দিন চার রাত্রি লাগবে, কারণ অনেক ঘুরে জঙ্গলপথে যেতে হবে।

এমন সময় মংলু সংবাদপত্রটা নিয়ে হাজির হলো।

রহমান মংলুর হাত থেকে সংবাদপত্রটা নিয়ে মেলে ধরলো বনহুরের সামনে।

বনহুর সংবাদপত্রখানা হাতে নিয়ে দেখলো প্রথম পৃষ্ঠায় মস্তবড় একখানা ফটো। ফটোর নিচে লেখা আছে "মিস মিনারা মির্জা নিখোঁজ। তারপর নিচে লেখা আছে—যে ব্যক্তি এর সন্ধান দিতে পারবে তাকে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

বনহুর কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ফটোখানা লক্ষ্য করলো, তারপর রহমানের হাতে সংবাদপত্রখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললো—হীরা নগরীতে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। সঙ্গে এই সংবাদপত্রখানা নিও, ছবিটার দরকার পড়তে পারে।

রহমান বললো সর্দার, কান্দাই শহরে এখন পুলিশমহলে আপনাকে নিয়ে ভীষণ একটা আলোড়ন চলছে; কাজেই এ সময়

তা চলতে দাও। ইয়াকুব কেমন আছে?

ভাল আছে, আগামীকাল সে শহরের আস্তানায় চলে যাবে।

বনহুর এবার শয্যা গ্রহণ করলো।

সিগারেট কেসটা হাতে তুলে নিতেই রহমান আর মংলু বেরিয়ে যাবার জন্য কুর্ণিশ জানালো বনহুরকে।

বনহুর বললো—রহমান, একটু দাঁড়াও।

মংলু চলে গেলো।

রহমান দাঁড়িয়ে পড়লো।

বললো বনহুর—সবচেয়ে আমার বড় দুঃখ, তোমার একটা হাত নষ্ট হয়েছে।

সর্দার, আমার দুঃখ হয় না, কারণ একটা হাত গেছে তবু তো জীবনে বেঁচে আছি।

হাঁ, সে কথা অবশ্য ঠিক, যে অবস্থা থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি, সে অবস্থায় পড়লে কেউ জীবন নিয়ে ফিরতে পারতো না। একটু থেমে বললো বনহুর—রহমান, বড় আফসোস, দিপালীকে আমরা হারিয়েছি!

গা ধরে আসে বনহুরের, চোখ দুটো ছল ছল করে উঠে, বলে সে—তাকে আর কোনোদিন আমরা ফিরে পাবো না, কারণ সৌরজগৎ আমাদের বাস্তব জগতের চিন্তাধারার বাইরে। আর কোনোদিন সেই বিস্ময়কর জগতে যেতে পারবো কিনা কে জানে।

রহমান বলে উঠলো—সর্দার, দিপালীর জন্য আমাদেরও কম দুঃখ নেই কিন্তু যা ঘটে গেছে তা নিয়ে ভাবলে তো চলবে না। পৃথিবীর মানুষ আমরা স্বাভাবিক মানুষের জীবনে যা ঘটে তাই আমাদেরও জীবনে আসবে। জীবনে আসবে ঘাত-প্রতিঘাত, হাসি-কষ্ট, সুখ-দুঃখ—সব নিয়েই তো মানুষের জীবন।

কথা সত্য কিন্তু সাধারণ মানুষ মনে করে আমাদের জীবন মানে অন্য ধারায় প্রবাহিত। আসলে আমরাও মানুষ, রক্তে-মাংসে গড়া আমাদের দেহ। মনপ্রাণ বলে তাদের যেমন আছে তেমনি রয়েছে আমাদেরও। যাক, সে কথা রহমান, তুমি যদি যেতে না চাও তবে কায়েসকে প্রস্তুত হতে বলো। হীরা নগরীতে যাবো এবং দেখবো কে সেই দুষ্কৃতিকারী যে প্রেসিডেন্ট কন্যা মিস মিনারা মির্জাকে হরণ করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

রহমান বলে উঠলো—না সর্দার, আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আমি নিজে যাবো আপনার সঙ্গে।

বেশ, তাহলে তৈরি হয়ে নাওগে।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

অপর দরজা দিয়ে গুহায় প্রবেশ করলো নূরী। গম্ভীর মুখে বনহুরের শয্যা পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর হেসে বললো—কি ব্যাপার; চঞ্চল হরিণী হঠাৎ নিশ্চুপ কেন? কি হলো বলো তো?

হবে আবার কি?

নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, নাহলে কি আর নির্ঝরণী ঝরণা হঠাৎ থেমে যায়। কথাটা বলে বনহুর নূরীর হাত ধরে টেনে নেয় কাছে।

নূরী হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় বনহুররের বুকের উপর।

বনহুর বলে হঠাৎ অভিমান কেন?

এই তো কত সাধ্য-সাধনার পর দেশে ফিরে এলে, আবার চলে যাবে। হীরা নগরীর রাজকন্যার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন বলো তো?

ও, এবার বুঝেছি কেন এত গম্ভীর হয়ে পড়েছে। নূরী, আশা করছি আর এমন হবে না। তুমি বিশ্বাস করো আমি ইচ্ছা করে এমন বিলম্ব করিনি।

জানি তুমি ইচ্ছা করে করো না কিন্তু তোমার বিরহ কত যে যাতনাদায়ক, কত যে মর্মান্তিক....বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে নূরীর গলা। একটু থেমে বললো নূরী—জাভেদকে আশা নিয়ে যাবার পর আমি একটুও শান্তি পাইনা মনে। তুমি যদি যাও বাধা দেবো না, কিন্তু যাবার পূর্বে জাভেদকে আমার কাছে এনে দিয়ে যাও।

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটি মুখ, সে হলো আশা। বহুবার আশা তাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিলো, বহুবার সে বনহুরকে নানাভাবে সাহায্য করেছে কিন্তু তার প্রতিদানে সে বনহুরের কাছে কিছু পায়নি। বেচারী আশা তার সন্তানকে নিয়ে যদি খুশি হয়ে থাকে মন্দ কি!

কি ভাবছো?

নূরী, জানি জাভেদ আশার কাছে ভালই আছে এবং থাকবে।

আমি সে কথা শুনতে চাই না বা চাইনি।

তুমি জাভেদকে নিজের কাছে চাও, এই তো?

হ্যাঁ। কোন্ মা নিজ সন্তানকে কাছে পেতে না চায়?

নূরী, তোমার জাভেদ এখন ছোট্ট শিশুটি নেই। সে ইচ্ছা করলেই চলে আসতে পারে। কিন্তু কেন সে আসেনা?

আশা তাকে আসতে দেয় না।

আমি বিশ্বাস করি না, জাভেদকে কোনো শক্তিই আটকে রাখতে পারবে না তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ইচ্ছা হলে সে ঠিকই চলে আসবে। কিন্তু একটা কথা নূরী, জাভেদকে আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দেবো না সে যদি পূর্বের স্বভাব ত্যাগ না করে।

তার মানে? ভ্রু কুচকে প্রশ্ন করে নূরী।

এবার বনহুর বেশ গম্ভীর হয়ে পড়লো।

নূরী তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো—আমি চাই না জাভেদ আমার মত হোক।

হুর, এ তুমি কি বললে?

যা সত্য তাই বলছি নূরী, জাভেদকে আশা নিয়ে গিয়ে ভালই করেছে....

সত্যি এ তোমার মনের কথা?

হাঁ।

জাভেদ তোমার সন্তান...

কিন্তু তার প্রতি আমার কোনো...

চুপ করো! নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়।

বেশ, আমি কিছু বলবো না, এ ব্যাপারে, কারণ তুমি মা কাজেই দুঃখ পাবে।

হুর, তুমি নূরকে আলাদা চোখে দেখো।

হাঁ, তা সত্য, কারণ নূর জনসমাজে নিজকে একজন নিষ্ঠাবান মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, লেখাপড়া শিখে সে সুনাম অর্জন করেছে আর জাভেদ...

ওগো, তুমি নিজে একজন বিশ্ববিখ্যাত দস্যু হয়ে এ কথা বলো?

উদ্দেশ্য আমার মন্দ নয় তবু আমি দস্যু—একজন ডাকু। সাধারণ জনসমাজ আমার নামে ভীত, আতঙ্কিত। তুমি কি মনে করো এ আমার গর্ব?

হাঁ, হাঁ, আমি তাই মনে করি।

নূরী, তুমি জানো না আমার মনে কত ব্যথা। আমি নিজকে নিজে স্বীকার করি না একজন নাগরিক হিসেবে। তাহলে তুমি বোঝো আমি নিজে যা চাইনি তাই হয়েছি......অবশ্য আমার জীবন ছিলো একটু অন্য ধরনের, কাজেই বুঝতে পারছো কেন এ পথ আমি বেছে নিয়েছিলাম।

সে সব কথা জানি, সর্দার কালু খাঁ তোমাকে তার দায়িত্বভার দিয়ে না গেলে তুমি হয়তো আজ এ পথে পা বাড়াতে না।

কিন্তু।

বলো থামলে কেন?

কালু খাঁ অন্যায় করেনি, কারণ তার জীবনকাহিনী ছিলো অত্যন্ত দুঃখ আর বেদনাদায়ক, তাই তো সে বেছে নিয়েছিলো এই পথ। যাক ওসব কথা, নূরী, আমি জানি জাভেদ আশার কাছে ভালই থাকবে। যখন ওর ইচ্ছা হবে চলে আসবে তোমার কাছে।

তাই বলে তোমার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে না ওকে?

একটু হাসলো বনহুর, তারপর বললো—কত ইচ্ছাকেই না পরাজিত করেছি। এটা তো সয়ে গেছে নূরী।

তোমরা পুরুষ মানুষ, সব তোমাদের সয়ে যায়।

আচ্ছা নূরী, তুমি এত সহজে নিজ সন্তানকে কি করে অপরের হাতে তুলে দিলে? এতে তোমার মন ব্যথিত হলো না?

নূরী ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো, কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো—শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি জাভেদকে তার হাতে তুলে দিয়েছি। আমি জানি আমার সন্তান আমারই থাকবে, শুধু তাকে খুশি করাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য—

তাহলে তোমার ব্যস্ততার কোনো কারণ নেই।

তুমি যাই বলো, তোমাকে যেতে দেবো না হুর।

তুমি গভীরভাবে একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে নূরী ব্যাপারটা কত সাংঘাতিক। একটি অসহায় মেয়েকে কোনো দুষ্টের দল হরণ করে নিয়ে গিয়ে লাখ লাখ টাকার সোনা দাবি করে বসেছে।

নূরী বলে উঠলো—সে জন্য রয়েছে পুলিশমহল।

নূরীর কথায় অট্টহাসি হেসে তারপর হাসি থামিয়ে বনহুর বললো—পুলিশমহল কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান সত্য কিন্তু আসল ব্যক্তিকে তারা খুঁজে বের করতে মোটেই সজাগ নয়, কারণ ইচ্ছা থাকলেও তারা প্রায়ই বিফল হন এ ব্যাপারে, কাজেই বুঝতে পারছো.....

যদি যাও তবে আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। তোমাকে একা আমি ছাড়বো না।

হাসলো বনহুর, তারপর বললো—এখনো তোমার ছেলে মানুষি গেলো না নূরী।

ওকে টেনে নিলো বনহুর নিবিড় করে।

নূরী বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বললো—আর আমি তোমাকে ছাড়বো না।

❑

নূরীর বাধা বনহুরকে ক্ষান্ত করতে পারলো না।

রহমান আর বনহুর অশ্ব নিয়ে রওয়ানা দিলো হীরা নগরীর উদ্দেশ্যে।

তাদের অশ্ব দুটি উল্কাবেগে ছুটে চললো।

বন জঙ্গল প্রান্তর পেরিয়ে অশ্ব দুটি ছুটছে, তাদের খুরের শব্দের প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ প্রান্তর মুখরিত করে তুলছে।

জেব্রু জঙ্গলে এসে পড়লো এবার বনহুর আর রহমানের অশ্ব।

এ জঙ্গলে তারা কোনোদিন আসেনি। পথ সহজ করে নেবার জন্য বনহুর আর রহমান এ জঙ্গলের পথ ধরে এসেছে।

গভীর জঙ্গল।

বনহুর আর রহমান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো।

রহমান বললো সর্দার, এ বন দিনের আলোতেই অতিক্রম করতে হবে, কারণ এই জেব্রু জঙ্গল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এই জঙ্গলে নাকি এক ধরনের মানুষ আছে তাদের আকৃতি কতকটা গরিলার মত। ভীষণ হিংস্র....

কথা শেষ হয় না রহমানের, ঠিক ঐ মুহূর্তে পাশের ঝোপের মধ্য হতে একটি মাথা বেরিয়ে এলো, সেকি বিকট আকার মাথাটা।

রহমান আর বনহুর বিস্মিতভাবে এ ওর মুখে তাকালো। বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে দ্রুত বের করলো রিভলভার।

রহমানও তার পকেট থেকে রিভলভার বের করেছে।

বিরাট মনুষ্য আকার জীবটিকে লক্ষ্য করতেই সে মুখের কাছে হাত নিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে উঠলো।

ততক্ষণে রহমানের রিভলভার গর্জে উঠেছে।

মনুষ্য আকার জীবটা আর্তনাদ করে উঠলো এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতের বাজু চেপে ধরলো। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে জীবটার ডান হাতখানা।

ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে।

বনহুর বললো—কেন গুলী ছুড়তে গেলে রহমান? ও তো আমাদের আক্রমণ করেনি।

সর্দার, ভয়ঙ্কর জীব, আক্রমণ করলে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় ছিলো না।

তাই বলে সে—কথা শেষ না করে বনহুর আর রহমান তাকালো জীবটার দিকে। সে তখন টলতে টলতে চলে যাচ্ছে।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—আশ্চর্য্য জীবটা কোনো রকম আক্রমণ না করেই চলে যাচ্ছে।

রহমান বললো সর্দার, চলুন আমরা তাড়তাড়ি সরে পড়ি।

সরে পড়বার পূর্বে দেখতে চাই জীবটা কোথায় যায় এবং কি করে।

সর্দার, বিপদে পড়তে পারি।

সে কথা অবশ্য সত্য কিন্তু আমি দেখতে চাই এটা গরিলা না মানুষ জাতীয় কোনো জীব।

অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো বনহুর।

রহমানও চেপে বসলো তার নিজ অশ্বপৃষ্ঠে।

এলো পাতাড়ি না ছুটে এবার বনহুর আর রহমান সেই বিরাট জীবটার পেছনে অগ্রসর হলো।

জীবটা এগিয়ে যাচ্ছে।

যেন বিরাট একটি গরিলা।

বনহুর বললো—রহমান, তুমি যাই বলো এই জীবটা গরিলা নয়। আসলে ওটা কোনো বনমানুষ।

রহমান নিজ অশ্বপৃষ্ঠে থেকে বললো—ঠিকই বলেছেন, গরিলা এর চেয়ে আকারে অনেক বড়। এর আকার মানুষ থেকে খুব বড় নয়।

দেখছো রহমান, জীবটার পরনে কিন্তু জন্তুর চামড়া রয়েছে।

এতক্ষণে বনহুর বা রহমান এটা লক্ষ্য করবার সময় পায়নি, কারণ ঝোপঝাড় আগাছার আড়ালে তার দেহের কিছু অংশ ঢাকা ছিলো। এখন জীবটা বেশ দূরে চলে গেছে, তাই স্পষ্ট নজরে পড়ছিলো।

বনহুর আর রহমানের অশ্ব খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলো। জীবটা যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য ঝোপঝাড়ের আড়ালে আত্নগোপন করে অগ্রসর হচ্ছিলো তারা।

আরও কিছুটা এগুনোর পর হঠাৎ থেমে গেলো জীবটা। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে শব্দ করে ডাকলো। ঠিক যেমন করে মানুষ কোনো বিপদ পড়লে তার দলবলকে ডাকে।

আশ্চর্য হলো বনহুর আর রহমান।

বনহুর বললো—রহমান, দেখো ও সঙ্গীদের ডাকছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে ওর সঙ্গীরা।

সর্দার, এখন আমরা এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে পারি।

তা ঠিক কিন্তু আমি দেখতে চাই ওরা কি করে।

সর্দার!

জানি বিপদ আসতে পারে—

কথা শেষ হয় না বনহুরের, অসংখ্য জংলী বনমানুষ হাতে নানা ধরনের ডালপালা আর পাথরে তৈরি অস্ত্র নিয়ে ছুটে আসে। এক একজন সেকি হুংকার ছাড়ছে।

রহমান বললো—সর্দার দেখুন—

দেখতে পাচ্ছি। তুমি ওকে গুলী করে ভুল করেছো।

সর্দার, ওরা এদিকে ছুটে আসছে।

দেখতে পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ওদিকে জঙ্গলে আত্নগোপন করতে হবে। রহমান, দেখো ওরা সবাই কিন্তু জন্তুর চামড়া দিয়ে লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করছি সবার হাতে পাথরে তৈরি অস্ত্র। কাজেই এরা একেবারে বনমানুষ নয়।

বনহুরের কথা মুখেই রয়ে গেলো, তিন-চারজন বনমানুষ বনহুর আর রহমানকে ঘিরে ধরলো। তারা পাথুরে বর্ষা উদ্যত করে ধরেছে।

বনহুর আর রহমান এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো। এভাবে যে আক্রমণ করবে এটা বনহুর জানতো। বললো রহমান—এদের সম্বন্ধে আমার যা জানার ছিলো হয়ে গেছে, এবার আমরা এ জঙ্গল থেকে সরে পড়তে পারি।

সর্দার, আর মুহূর্ত বিলম্ব নয়, এক্ষুণি ঐ ঝোপটার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এদিকে আসুন সর্দার—

রহমান বিপরীত দিকে অশ্বমুখ ফিরিয়ে নিলো।

বনহুরও তার অশ্বকে ফিরিয়ে নিলো। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো তারা।

ওদিকে বনমানুষগুলো জলস্রোতের মত এগিয়ে আসছে। সবার হাতে কাঠ ও পাথরে তৈরি অস্ত্র।

অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করে চিৎকার করছে ওরা।

বনহুর আর রহমানের অশ্ব দুটি তখন ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত ছুটে চলেছে। কোনো দিকে উঁচু টিলা, কোনোদিকে গভীর জঙ্গল, কোনোদিকে পানির ঝরণা।

তাজ আর দুলকী যেন বুঝতে পারে তাদের বিপদ এগিয়ে আসছে, তাই তারা প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলো।

পেছনে শোনা যাচ্ছে জংলী মানুষগুলোর ক্রুদ্ধ হুঙ্কার।

ততক্ষণে বনহুর আর রহমান অশ্বপৃষ্ঠে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

❑

তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেছে। এবার আমরা হীরা নগরীর নিকটে পৌঁছে গেছি, কি বলো রহমান?

হাঁ সর্দার।

বনহুর শুকনো রুটি কামড়ে খাচ্ছিলো। একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে ছিলো সে, সম্মুখে পানির মশক। রহমান মশক থেকে পাত্রে পানি ঢেলে সর্দারের দিকে বাড়িয়ে ধরলো—নিন, পানি পান করুন।

বনহুর রহমানের হাত থেকে পানি নিয়ে পান করলো। তারপর শূন্য পাত্রটা রহমানের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললো—তুমি বুদ্ধি করে এসব সঙ্গে নিয়েছিলে, মন্দ করোনি রহমান।

সর্দার, আমি জানতাম পথে আমরা কোনো হোটেল বা খাবারের দোকান পাবো না, এমন কি বিশুদ্ধ পানিও পাওয়া যাবে না, তাই...

হাসলো বনহুর।

রহমান নিজে রুটি আর পানি পান করে সব গুছাতে লাগলো। যদিও রহমান একটা হাত হারিয়েছে তবু তার এতটুকু পরিবর্তন ঘটেনি। কার্যদক্ষতায় তার সমতুল্য যেন কেউ নয়।

অল্পক্ষণে সব গুছিয়ে নিলো রহমান।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

ওদিকে তাজ আর দুলকী মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছিলো।

বনহুর শিষ দিলো ঠিক পূর্বে যেমন করে সে শিসদিতো তেমনি করে।

মুহূর্তে তাজ ছুটে এলো বনহুরের পাশে।

তাজের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে আনন্দদীপ্ত ভাব। পশু হলেও সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করছে প্রভুকে সে কাছে পেয়েছে।

তাজ বনহুরের পাশে এসে দাঁড়াতেই বনহুর ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে লাগাম ধরলো।

রহমান এগিয়ে গিয়ে দুলকীকে নিয়ে এলো।

তারপর উভয়ে চেপে বসলো অশ্বপৃষ্ঠে।

বন-জঙ্গল-প্রান্তর পেরিয়ে নতুন শহর হীরা নগরীতে এসে পৌছলো বনহুর আর রহমান।

বনহুর আর রহমানের শরীরে একই পোশাক। কতকটা আরবী ধরনের। মাথায় পাগড়ি, কানে উভয়েরই বালা রয়েছে।

পায়ে নাগড়া জুতা।

একটা হোটেলের সামনে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর আর রহমান।

হোটেলে তখন খানাপিনা চলেছে।

একটা নাচনে ওয়ালী নাচ পরিবেশন করে চলেছে।

অদ্ভুত ধরনের সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে হোটেলের ভিতর থেকে।

বনহুর আর রহমান হোটেলে প্রবেশ করলো।

দরজায় দাঁড়িয়ে ওরা দৃষ্টি ফেললো চারিদিকে।

একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতেই সব বুঝে নিলো বনহুর।

রহমান এগিয়ে গিয়ে সামনে একটা টেবিলে বসলো।

বনহুর এগিয়ে গেলো ভিতরের দিকে।

কোটটা খুলে কাঁধে নিলো।

নর্তকী তখন নতুন ভঙ্গিমায় নেচে চলেছে। বনহুরকে দেখে নর্তকীর চোখ দুটো চকচক্ করে উঠলো, মুহূর্তের জন্য নৃত্য থেমে গেলো ওর।

বনহুর একটা থামের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

নর্তকীটা ওড়না উড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীমায় নাচতে নাচতে এগিয়ে এলো বনহুরের দিকে।

বনহুর মৃদু হাসলো।

রহমান টেবিলে বসতেই তার সামনে বয় কফি দিয়ে গেলো। কফির কাপ হাতে তুলে নিয়ে রহমান আড়চোখে তাকালো বনহুরের দিকে।

নর্তকী এসে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে গানের ভাষায় কিছু বলছে।

রহমান লক্ষ্য করতে লাগলো চারিদিকে, মাঝে মাঝে সে কফির পাত্রে চুমুক দিচ্ছিলো। হঠাৎ রহমানের দৃষ্টি চলে গেলো ওদিকের টেবিলে। সে দেখলো একজন কুৎসিত চেহারার লোক বসে আছে, ঘিরে বসে আছে ছয়জন লোক। সবাই ভয়ংকর। তারা বনহুরের দিকে তাকাচ্ছে কটমট করে আর ফিস ফিস করে কিছু বলছে।

রহমানের সন্দেহ হলো।

সে সজাগ হয়ে বসলো।

ইতিমধ্যে কফি পান শেষ করা হয়ে গিয়েছিলো রহমানের। কোট দিয়ে বাম হাতখানা তার ঢাকা রয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে রহমান ওদিকের টেবিলে বসা লোকগুলোকে।

বনহুর কিন্তু তখনও থামটার সঙ্গে ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত দু'খানা বগলের নিচে চাপা আছে। মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

নর্তকী বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে কিছু বললো, তারপর নাচতে শুরু করলো সে।

বনহুর সজাগ হয়ে উঠলো।

ডান হাতখানা তার নেমে এলো কোমরের দিকে।

হঠাৎ গুপ্ত প্রকৃতির লোক দুজন এগিয়ে এসে বনহুরের দু'পাশে সূতীক্ষ্ণধার ছোরা বের করে ধরলো।

রহমান উঠে দাঁড়ালো তার টেবিলে।

হোটেলে সবার দৃষ্টি বনহুর আর সেই গুন্ডা লোক দুটির দিকে। হঠাৎ কি ব্যাপার কেউ বুঝতে না পারলেও বুঝতে বাকী নেই রহমান আর বনহুরের। নতুন লোককে ওরা এ হোটেলে ভাল নজরে দেখে না, এটাই তার প্রমাণ। কিন্তু কেন তারা এ ব্যাপারে সজাগ এটা কারও জানা নেই।

বনহুর দু' পাশের দু'জনের দিকে তাকালো।

গুন্ডা দু'জনের চোখ হিংস্র জন্তুর মত জ্বলে উঠলো ধক ধক করে।

দু'জনের কোমরের ভিতর থেকে বের করলো ধারালো ছোরা।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

ঠিক ঐ সময় রহমান এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পেছনে। যেই ওরা বনহুরকে আক্রমণ করবে অমনি রহমান মেঝের কার্পেট ধরে ভীষণ জোরে টান মারলো।

সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো বনহুর এবং তার পাশের দু'জন গুন্ডা লোক।

আচমকা এজন্য প্রস্তুত ছিলো না গুন্ডালোক দু'জন। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতেই রহমান বনহুরের দিকে ছুড়ে দিলো রিভলভারখানা।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রিভলভার উঁচিয়ে ধরলো। ততক্ষণে গুন্ডালোক দু'জন উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপর যখন তারা উবু হয়ে নিজ নিজ ছোরা তুলে নিতে গেলো তখন বনহুর ছোরার পাশে মেঝেতে গুলী ছুঁড়লো।

লোক দু'জন চমকে সরে দাঁড়ালো কয়েক পা।

ঐ মুহূর্তে বনহুর সম্মুখস্থ সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে গেলো উপরে।

এবার গুন্ডালোক দু'জন ছাড়াও ঐ টেবিলে বসে যারা বনহুরকে লক্ষ্য করে ফিস ফিস করে কিছু বলছিলো তারাও ছুটলো বনহুরকে পাকড়াও করার জন্য।

বনহুর ততক্ষণে উঠে গেছে উপরে।

সম্মুখে একটা দরজা।

বনহুর দরজার দিকে তাকালো।

দরজা ভিতর হতে বন্ধ।

বনহুর বারান্দা বেয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো।

সম্মুখে একটা শিকল রয়েছে ঝুলন্ত অবস্থায়। বনহুর শিকল ধরে টান দিলো, সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের পায়ের তলার তক্তা সরে গিয়ে পড়ে গেলো নিচে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হলো বনহুর, দেখলো একটা কক্ষে নানা ধরনের প্যাকেট করা বাক্স। একেবারে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত থাক থাক করে সাজানো। বনহুর দু'চোখ বিস্তারিত করে দেখলো এক পাশে আর একটা সুড়ঙ্গমুখ। বনহুর সেই সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। কিছুটা এগুতেই আরও বিস্মিত হলো সে, দেখলো একটা গুহা বা ভূগর্ভ-কক্ষ। কক্ষটার চারপাশে নানা ধরনের রশির সঙ্গে ঝুলছে নরকংকাল।

ভূগর্ভ কক্ষ হলেও বেশ আলো আছে সেই কক্ষগুলোর ভিতরে। তাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বনহুর সবকিছু। ছাদের কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে নরকংকালগুলো। বনহুর অবাক হয়ে দেখছে, মুহূর্তে বুঝে নিলো বনহুর সবকিছু। হোটেলটিকে তারা সাধারণ হোটেল বলে মনে করে ছিলো কিন্তু হোটেলটি তা নয়। এর ভিতরে রয়েছে গভীর রহস্য।

বনহুর নরকংকালগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে, এরা এক একজন জীবন্ত মানুষ ছিলো, হাসি-কান্না সুখ-দুঃখে ভরা ছিলো এদের জীবন। এদেরও ছিলো পিতা-মাতা, স্ত্রী কন্যা পুত্র আত্মীয়-স্বজন। এরাও পৃথিবীর বুকে বাঁচার আশা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলো কিন্তু বাঁচতে পারলো না। যমদূত এদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা চিরতরে মুছে দিয়েছে।

কিন্তু এরা কারা? কি এদের পরিচয় ছিলো কিছুই জানে না বনহুর। এলোমেলো নানা চিন্তা ছড়িয়ে পড়ছিলো তার মনে। এরা কি নারী না পুরুষ ছিলো? কি এদের অপরাধ যার জন্য হত্যা করা হয়েছিলো এদের...

কে এর জবাব দেবে, নরকংকালগুলোকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিলো বনহুরের। সত্যি ওরা যদি তার কথার জবাব দিতে পারতো তাহলে সব পরিষ্কার হয়ে যেতো। বনহুর নর কংকালগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো। একটি নরকংকালের হাত ধরতে গেলো, অমনি পেছনে শব্দ হলো কেউ যেন এ কক্ষে প্রবেশ করছে। কারও জুতোর শব্দ বলে মনে হলো।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে একটি কংকালের পেছনে আত্মগোপন করে ফেললো।

নজর রইলো তার দরজার দিকে।

দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো দু'জন লোক। তারা অপর এক জনকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। যাকে ওরা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে তার মুখমন্ডল ফ্যাকাশে, ভয়-বিহ্বল লোকটাকে দেখে বেশ ভদ্র এবং শিক্ষিত মনে হলো। বনহুর সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

বনহুর প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিলো, ভেবেছিলো হয়তো রহমান হবে। কিন্তু যখন দেখলো ব্যক্তিটা রহমান নয় অপর একজন, তখন সে বুঝতে পারলো, রহমান তাহলে শত্রুহস্তে এখনও বন্দী হয়নি। কিছুটা আশ্বস্ত হলো সে। ওদের লক্ষ্য করতে লাগলো বনহুর।

লোকটাকে ধাক্কা মেরে কক্ষটার মধ্যে নিয়ে এলো এরা। তারপর দু'জন দু'পাশ থেকে ওর বাহু এঁটে ধরে প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিয়ে কিছু বললো।

লোকটা কোনো জবাব দিলো না, শুধু তার মুখ থেকে গোঙ্গানির মত শব্দ বের হলো।

শয়তান লোক দু'জন বন্দী লোকটার চোয়ালে প্রচন্ড আঘাত করলো। একজন প্রশ্ন করলো—বল আর আমাদের পিছু লাগবি?

লোকটার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না।

দ্বিতীয় শয়তান লোকটা দাঁতে দাঁত পিষে বললো—ঐ যে কংকালগুলো ঝুলছে তারই মত হবে তোর অবস্থা। যারাই আমাদের পিছু লেগেছে, তাদেরকেই আমরা এখানে এনে কংকাল করে রেখেছি...

বন্দী লোকটা একবার চোখ তুলে সম্মুখস্থ ঝুলন্ত কংকালগুলোকে দেখে নিলো। ললাট বেয়ে ঘাম ঝরছে। তার সঙ্গে মেশানো রয়েছে লাল টকটকে রক্ত। জামার স্থানে স্থানে ছিড়ে গেছে। প্যান্ট কোটও বড় এলোমেলো, কোনো কোনো জায়গায় কাদা আর রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

বনহুর বুঝতে পারলো বন্দী লোকটাকে পাকড়াও করবার সময় খুবধস্তাধস্তি হয়েছে। কিন্তু কে এই লোকটা, যাকে এইভাবে ধরে এনে এরা নরকঙ্কাল বানাবার সুযোগ নিচ্ছে। বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো।

একজন নরপশু বললো—জানো মিঃ জ্যাম্স, তোমার মত সাত জন প্রখ্যাত গোয়েন্দার নরকঙ্কাল এখানে ঝুলছে....

হ্যাঁ, কি বললে? বন্দী লোকটা আঁতকে উঠলো যেন।

বনহুর মনোযোগ সহকারে কান পেতে শুনতে লাগলো।

বললো নরপশু দ্বিতীয় জন—মিঃ জ্যাম্স তুমি আর কোনোদিন পৃথিবীর আলো দেখবে না। শুধু তুমি নও, তোমার মত যারাই আমাদের পেছনে লাগবে, তাদের সবাইকে আমরা এক এক করে নরকঙ্কালে পরিণত করবো।

বনহুর আড়ালে থেকে সব শুনতে পাচ্ছে। এই নরকঙ্কালগুলোর মধ্যেই আছে কয়েকজন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ যারা নরশয়তানগুলোকে গ্রেপ্তারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন কিন্তু তাঁদের নাম তো জানে না বনহুর। নাইবা জানলো, নাম জানতে বেশি বেগ পেতে হবে না। কারা নিখোঁজ হয়েছেন মানে কোন্ কোন্ প্রখ্যাত গোয়েন্দা নিখোঁজ হয়েছেন তাঁদের নাম নিশ্চয় সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছিলো, কাজেই নাম জানতে বেগ পেতে হবে না।

চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হলো বনহুরের।

বললো প্রথম জন—এবার আঁচ করেছো আমাদের কিছু লাগার পরিণাম কত ভয়ানক। চিঠি দিয়ে সাবধান করে দিয়েছিলাম তবু ক্ষান্ত না হয়ে কৌশলে আমাদের পাকড়াও করবার চেষ্টা করছিলে, এবার বুঝবে মজাটা।

ওরে মূর্খের দল, তোমরা জানো না আমাদের দল শুধু এক জায়গায় নেই। গোটা হীরা নগরীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এমন কী হীরার পর্বতের

অভ্যন্তরেও আমাদের আস্তানা আছে, রঘুনাথ সেই গোপন আস্তানার মালিক। আরও একটা সংবাদ শুনে যাও গোয়েন্দা মিঃ জ্যাম্‌স, যার সন্ধানে তোমরা হন্যে হয়ে ছুটাছুটি করছো সেই পরম রত্ন প্রেসিডেন্ট কন্যা মিস...

কি বললে?

হাঁ, যার জন্য তোমরা তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়ে চলেছো সেই তরুণী আমাদের হীরা পর্বতের গোপন গুহায় অধিক রয়েছে...

বলো কি!

হাঁ, যা বলছি সত্য। তুমি শুনে যাও যদি প্রেসিডেন্ট আমাদের দাবি পূরণ না করেন তাহলে মিস মিনারার ছিন্ন মস্তক উপহার দেওয়া হবে প্রেসিডেন্টকে...

এ তোমরা কি বলছো শয়তান?

যা শুনলে সত্য কিন্তু মনে রেখো, কোনোদিন তুমি মুক্তি পাবে না যে গিয়ে জানাবে তোমার টিকটিকি বন্ধুদের। সে কাজটির সুযোগ আর হবে না কোনোদিনই, বুঝলে? কথাটা বলে লোকটা বন্দীর গলার টাই ধরে ঝাঁকুনি দিলো।

এত জোরে ঝাঁকুনি দিলো যে বন্দী লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো, সামলে নিলো সে কোনো মতে।

বলির পশুর মত অসহায় লাগছে লোকটাকে।

বনহুর সব শুনলো আড়াল থেকে।

শয়তান লোক দু'টার আচরণ সে দেখছে, সব সে অনুভব করছে অন্তর দিয়ে। হঠাৎ এমন সুযোগ আসবে ভাবতে পারেনি বনহুর। মনে মনে আওড়িয়ে নিলো হীরা পর্বতের অভ্যন্তরে আস্তানা আছে, সেখানে বন্দী রয়েছে হীরা নগরীর প্রেসিডেন্ট কন্যা...

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো বনহুর, হঠাৎ বন্দী আর্তনাদ করে উঠলো। দেখলো বনহুর, লোকটাকে একটা আসনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে শয়তানদ্বয়। এবার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রথম ব্যক্তি একটা সুইচ টিপলো, সঙ্গে সঙ্গে ওর গলায় নেমে এলো একটা ফাঁস এবং মুহূর্তে বন্দীর দেহটা শূন্যে ঝুলে পড়লো।

ততক্ষণে দ্বিতীয় ব্যক্তির বিস্ময়কর একটা অস্ত্র থেকে শব্দবিহীন গুলী নিক্ষিপ্ত হলো বন্দীর বুক লক্ষ্য করে। এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেলো যে

বনহুরের হাতে অস্ত্র থাকতেও সে বন্দীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারলো না।

তবে বনহুর ওদের রেহাই দিলো না, ঝুলন্ত কংকালের আড়াল থেকে প্রথম ব্যক্তির বুক লক্ষ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো শয়তান প্রথম ব্যক্তি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হকচকিয়ে গেলো। কি করে কি হলো—তার সঙ্গীর এমন অবস্থা হলো কেন, কিন্তু বেশিক্ষণ সে ভাববার সময় পেলো না, বনহুর দ্বিতীয় জনকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

কিন্তু ধূর্ত লোকটা ঐ মুহূর্তেই পা দিয়ে মেঝেতে চাপ দিলো।

গুলী ওর বুকে বিদ্ধ হবার পূর্বেই সে মেঝে সহ নেমে গেলো নিচে।

বনহুরের গুলী পিছে দেয়ালে বিদ্ধ হলো।

বনহুর তাকালো কিছুক্ষণ পূর্বে আটক করে আনা সেই বন্দী ঝুলন্ত মিঃ জ্যাম্‌সের মুখের দিকে। একটু পূর্বেও সে কথা বলছিলো বাঁচার জন্য তাঁর কত প্রচেষ্টা ছিলো—আর এই মুহূর্তে তাঁর সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। চোখ দুটো অর্ধমেলিত জিভখানা কিছুটা বেরিয়ে পড়েছে। হাত দু'খানা দু'পাশে ঝুলছে। জুতোসহ পা দু'খানা শূন্যে...

বনহুরের ভাববার সময় নেই, অস্ফুট কণ্ঠে বললো— মিঃ জ্যাম্‌স, তোমার ভাগ্য মন্দ, তাই পারলাম না তোমাকে রক্ষা করতে। তুমি ঝুলন্ত কংকাল হয়ে থাকবে এই অন্ধ গুহায়...কথা শেষ হয় না বনহুরের, তার কানে ভেসে আসে একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ। যেন কোনো একটা মেশিন দেয়ালের ওপাশ থেকে গুহা বা কক্ষে এগিয়ে আসছে।

বনহুর সজাগ হয়ে দাঁড়ালো।

তাকালো সে চারপাশে ঝুলন্ত কংকালগুলোর দিকে। কতকগুলো অসহায় ব্যক্তির শেষ পরিণতি এই কংকালগুলো। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের কথা চিন্তা করবার সময় হলো না।

একপাশে দেয়াল সরে গেলো।

ভিতরে প্রবেশ করলো একটা গোলাকার যান। যানটা প্রবেশ করতেই যানের দরজা খুলে গেলো, তিনজন লোক বেরিয়ে এলো সেই যানটার ভিতর থেকে। তারা ব্যস্ততার সঙ্গে নেমে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালো।

বনহুর কিন্তু তার পূর্বেই আত্মগোপন করে ফেলেছে। দেখছে সে মনোযোগ সহকারে। ওরা কারা, কি উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা এসেছে।

যান থেকে লোক তিনজন নেমে পড়লো। মৃত ব্যক্তিটার দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো, মৃত ব্যক্তিটা তাদের দলের লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লোক তিনজন উবু হয়ে দেখলো তারপর ঝুলন্ত মিঃ জ্যাম্‌সকে পরীক্ষা করে দেখলো সত্যিই তার মৃত্যু ঘটেছে কিনা।

এরপর ওরা কক্ষটা তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালালো।

বনহুর আড়ালে আত্মগোপন করে আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না, তাই সে একজনকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

অব্যর্থ লক্ষ্য বনহুরের।

লোকটা তীব্র আর্তনাদ করে পড়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে লোক দুজন আশ্চর্য চোখে তাকালো যে দিক থেকে গুলীটা এসেছিলো সেই দিকে।

বনহুর এবার আর আত্মগোপন করে রইলো না, সে দ্রুত আড়াল থেকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের উপর। রিভলভার ইতিমধ্যে সে কোমরের বেল্টে গুঁজে রেখে দিয়েছে।

লোক দু'জন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো।

তারপর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো ওরা ক্ষিপ্রগতিতে। তবে বনহুরের আক্রমণে ওদের হাতের অস্ত্র ছিটকে পড়ে গিয়েছিলো দূরে। একজন অস্ত্রের দিকে এগুতেই বনহুর তার হাতের উপর দক্ষিণ পা খানা রাখলো।

অপরজন পেছন থেকে জাপটে ধরতে গেলো বনহুরকে। বনহুর ফিরে দাঁড়িয়ে প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো তার চোয়ালে।

ছিটকে পড়লো লোকটা হুমড়ি খেয়ে।

বনহুর সামনের ব্যক্তিকে আক্রমণ করলো।

চললো ভীষণ ধস্তাধস্তি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুরকে ওরা কৌশলে ধরে ফেললো এবং সেই ঝুলন্ত মেশিনের দিকে টেনে নিয়ে বললো, কোনোক্রমে মেশিনে তুলে দিতে পারলেই ব্যস্ ঝুলন্ত কংকালে পরিণত হবে সে।

ঠিক সেই ঝুলন্ত মেশিনটার কাছাকাছি নিয়ে যেতেই পেছন থেকে একজনের পিঠে একটা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো।

আর্তনাদ করে উঠলো সে।

অমনি দ্বিতীয় জনের হাতখানা হঠাৎ আল্‌গা হয়ে পড়লো।

বনহুর মুহূর্তে নিজকে মুক্ত করে নিলো এবং প্রচন্ড ঘুষি বসিয়ে দিলো লোকটার চোয়ালে।

ততক্ষণে ছোরাবিদ্ধ লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো মেঝেতে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো রহমান দাঁড়িয়ে আছে দরজার উপরে। সেই যে ছোরাখানা ছুড়ে শয়তানকে হত্যা করেছে বেশ বুঝতে পারলো। কিন্তু রহমানকে লক্ষ্য করবার সময় তখন ছিলো না বনহুরের, সে ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার উপর।

লোকটা তখন সঙ্গীদ্বয়ের অবস্থা দেখে ভীষণ ভড়কে গেছে, সে বনহুর সহই যানটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। যানটার উপরই চললো ধস্তাধস্তি।

শয়তান লোকটা হঠাৎ যানটার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দিলো। অমনি যানটা চলতে শুরু করলো, এবং অতি দ্রুত দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করলো।

রহমান হতভম্ব হয়ে যায়, সে দেখলো যানটা দেয়ালের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালটা পূর্বের মত হয়ে গেলো। কেউ বুঝতেও পারবে না ওখানে কোনো দরজা বা সুড়ঙ্গপথ আছে।

বনহুর আর লোকটা যান সহ উধাও হবার পর রহমানের দৃষ্টি পড়লো কংকালগুলোর দিকে। আঁতকে উঠলো সে। বহু নরকংকাল সে দেখেছে কিন্তু এমন ঝুলন্ত অবস্থায় নরকংকাল দেখেনি।

বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগলো সে।

হঠাৎ তার নজরে পড়লো মিঃ জ্যামসের ঝুলন্ত দেহটা। এখনও জীবন্ত মনে হচ্ছে তাকে।

চোখ দুটো অর্ধ মেলিত।

জিভ কিছুটা বেরিয়ে আছে একপাশে।

লোকটাকে যে একটু পূর্বে হত্যা করা হয়েছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলো রহমান। এবার রহমান মিঃ জ্যাম্সের কাছে এগিয়ে গেলো এবং তাঁর কোটের পকেটে হাত প্রবেশ করিয়ে দিলো। পকেটে যে কিছু আছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছিলো। রহমান পকেটে হাত দিতেই পেলো একটা ক্ষুদ্র টেপরেকর্ড। রহমান টেপরেকর্ডখানা বের করে দেখলো তখনও চালু আছে সেটা।

টেপরেকর্ড অফ করে দিয়ে নিজের পকেটে রাখলো রহমান। অত্যন্ত ক্ষুদ্র টেপরেকর্ডখানা। রহমান সেটা পকেটে লুকিয়ে রাখলো।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে রহমান, কখন কোন্ বিপদ এসে পড়ে কে জানে। যানটা বনহুর আর শয়তান লোকটাকে নিয়ে দেয়ালের ওপাশে গেলেও একটা শব্দ ভেসে আসছিলো। কান পেতে রহমান শব্দটা শুনতে লাগলো।

কিন্তু সামান্য সময় মাত্র।

রহমান কঙ্কালগুলোর উপর আর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো। পকেটের উপর হাত রেখে ক্ষুদ্র টেপরেকর্ড খানার অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো।

এখানে বেশিক্ষণ বিলম্ব করা উচিত হবে না, তাই রহমান দ্রুত দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো সেই বিস্ময়কর কক্ষ থেকে।

ওপাশে তখন চলন্ত যানটার উপরে চলেছে বনহুর আর সেই শয়তানটার ভীষণ লড়াই।

যানটা সা সা করে এগিয়ে যাচ্ছে।

শয়তানটা যানটার হ্যান্ডেল মাঝে মাঝে চেপে ধরছিলো, তখন যানটা ঠিকভাবে এগুচ্ছিলো, আর সে মুহূর্তে হ্যান্ডেল হাতছাড়া হচ্ছিলো, তখনই এলোমেলো চলছিলো।

শয়তানটা যেই এইবার হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়েছে, অমনি এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করলো যানটা।

বনহুর সম্মুখে একটা ঝুলন্ত হ্যান্ডেল চেপে ধরে ঝুলে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে যানটা গিয়ে প্রচন্ডভাবে আঘাত করলো ওদিকের একটা মেশিনে।

সেকি ভয়ঙ্কর শব্দ!

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ। চারিদিকে ছিটকে পড়লো মেশিনটার খন্ড খন্ড টুকরাগুলো।

লোকটার দেহও উড়ে গেলো খন্ড খন্ড হয়ে।

বনহুর যদি ঝুলন্ত হ্যান্ডেলটা চেপে ধরে ঝুলে না পড়তো তাহলে তার অবস্থাও ঐ লোকটার মত হতো। এতক্ষণে তার দেহের মাংসপিন্ডগুলো ছড়িয়ে পড়তো এই বিস্ময়কর কক্ষের দেয়ালের চারপাশে।

বনহুর মেঝেতে দাঁড়িয়ে খোদার কাছে শুকরিয়া আদায় করলো, তারপর তাকালো চারপাশে। শুধু মেশিন আর মেশিন। নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ভর্তি কক্ষটি।

বনহুর ভালভাবে সব লক্ষ্য করলো, বিস্মিত হলো সে। এত মেশিনারী সরঞ্জাম ইতিপূর্বে সে কোথাও দেখেছে কিনা সন্দেহ।

একটা অদ্ভুত মেশিন, নজরে পড়লো বনহুরের।

ঠিক যেন একটা বিরাট আকার চোখ, একবার জ্বলছে একবার নিভছে। সেই মেশিনটার নিচেই বিস্ময়কর কয়েকটি সুইচ।

বনহুর এসে দাঁড়ালো মেশিনটার পাশে।

চক্ষু জ্বলছে আর নিভছে।

বনহুর দেখলো দুটো সুইচ পাশাপাশি।

একটি সুইচে বনহুর যে চাপ দিলো অমনি চক্ষু আকার মেশিনটার মধ্যে একটা সাউন্ডবক্স বেরিয়ে এলো। সাউন্ডবক্সের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো কণ্ঠস্বর—সি, সি ওয়ান জিরো সি, সি ওয়ান জিরো...একটা সাংকেতিক শব্দ।

বনহুর পকেট থেকে নোটবুকটা বের করে নিয়ে টুকে নিলো সাংকেতিক শব্দটা। তারপর সুইচ অফ করে দিতেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলো।

এবার বনহুর তাকালো অন্যান্য মেশিনের দিকে।

বনহুর বুঝতে পারলো এই সাংকেতিক শব্দের পেছনে আছে কোনো এক উদ্দেশ্য। বনহুর তাই প্রতিটি মেশিনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করছিলো। ঐ সাংকেতিক শব্দ কোনো মেশিনে লেখা আছে কিনা। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে চললো সে প্রতিটি মেশিনের গায়ে।

না, কোনোটার গায়ে ঐ সাংকেতিক চিহ্ন মার্ক করা নেই। তবে ও কিসের সংকেত বনহুর ভাবছে, ঠিক এমন সময় তার কাঁধে কেউ হাত রাখলো।

চমকে ফিরে তাকালো বনহুর।

সম্পূর্ণ নতুন এক মুখ।

বনহুর ফিরে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বনহুরের চোয়ালে বসিয়ে দিলো প্রচন্ড এক ঘুষি।

টাল সামলাতে না পেরে বনহুর ওদিকের একটা মেশিনের উপর গিয়ে পড়লো।

কিন্তু মুহূর্তের জন্য।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর, মেশিনের একটা দাঁত লেগে কপালের এক পাশে কেটে গেছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে কপাল বেয়ে। বনহুর হাতের পিঠে রক্ত মুছে দাঁতে অধর দংশন করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার উপর।

চেপে ধরলো ওর গলা।

তারপর প্রচন্ড ঘুষি।

লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো এবং তড়াৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে তার হাতের দক্ষিণ পাশের মেশিনের সুইচ টিপে দিলো।

অমনি ভীষণ ধূয়ায় ভরে গেলো কক্ষটা।

বনহুর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো কিন্তু কিছুই তার নজরে পড়লো না। শুধু ধূয়া আর ধূয়া।

ধূয়া একটু হাল্কা হতে না হতেই বনহুর অনুভব করলো চারপাশে থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে কয়েকজন সশস্ত্র নরপশুর দল! বনহুর তখন নিরুপায়, সকলের হাতেই অস্ত্র এবং অস্ত্রগুলো তার বুকে-পিঠে-পাঁজরে আর তলপেটে চেপে আছে।

ধূয়া নিঃশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বনহুর বুঝতে পারলো সে বন্দী।

❑

জাভেদ, বড় দুঃসংবাদ! অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো আশা।

জাভেদ এগিয়ে এসে অশ্বটির লাগাম চেপে ধরলো। দু'চোখে প্রশ্নভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সে আশার মুখের দিকে।

আশা অশ্বপৃষ্ঠে মৃদু আঘাত করে বললো—ওকে যেতে দাও জাভেদ। কথা আছে তোমার সঙ্গে।

ততক্ষণে জাভেদ অশ্বটিকে একটা গাছের গোড়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে ফিরে এলো আশার পাশে। বললো—কি দুঃসংবাদ আশা আম্মু, বলো?

আশা মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে হাতে নিলো, তারপর বললো—জাভেদ, হীরা নগরীর কোনো এক স্থানে তোমার আব্বু বন্দী হয়েছে, আমি জানতে পেরেছি।

জাভেদ চমকে উঠলো, বললো—আব্বু হীরা নগরীতে বন্দী!

হাঁ।

এ সংবাদ তুমি কোথায় পেলে আশা আম্মু?

জাভেদ, তুমি এখনও আমার অনেক কিছু জানো না বা দেখোনি। তাহলে বুঝতে কি করে আমি জানতে পারলাম বনহুর বন্দী....একটু থেমে বললো আশা—বন্দী অবস্থায় তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

বলো, বলো আশা আম্মু, আমি এই মুহূর্তে রওয়ানা দেবো। দেখে নেবো কে বা কারা আমার আব্বুকে বন্দী করেছে......

বেশি উত্তেজিত হয়ো না জাভেদ, তোমাকে আমি পথ বলে দেবো।

কিন্তু আমার যে আর এক দন্ড তর সইছে না আশা আম্মু।

ধৈর্য ধরা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বনহুর এমন এক দলের কবলে পড়েছে, যে দলের শক্তি ভয়ংকর।

আমি সমস্ত শক্তি পরাজিত করে বাপুকে উদ্ধার করবো। আমার বাপু, আমার আব্বুকে এমন কোনো শক্তি নেই বন্দী করে রাখতে পারে......

জাভেদ যখন কথাগুলো বলছিলো তখন তার চোখেমুখে আশা বনহুরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছিলো। সেই দীপ্ত চেহারা, সেই প্রশস্ত ললাট, সেই নীল উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়। আশার মুখমন্ডল খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললো আশা—সাবাস বাপকা বেটা!

জাভেদ থামলো কিন্তু তার সমস্ত মুখে জড়িয়ে আছে একটা কঠিন দীপ্ত ভাব।

❑

বনহুরের দেহের সঙ্গে লৌহশিকল বাঁধা।

তাকে একটা চক্রাকার তক্তার সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে। এমনকি মাথাটা পর্যন্ত উঁচু করবার জো নেই তার।

উপরে ছাদটার দিকে তাকিয়ে দেখলো বনহুর, ছাদের সঙ্গে আটকানো রয়েছে অসংখ্যা সূতীক্ষ্ণধার ছোরা। ছাদটার যে অংশ ঠিক বনহুরের দেহের উপরিভাগে রয়েছে, সেই অংশে গাঁথা রয়েছে সূতীক্ষ্ণধার ছোরাগুলো। বুঝতে বাকী রইলো না তার যে ঐ সূতীক্ষ্ণধার ছোরাগুলো তার দেহ ভেদ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। কোনো একটা সুইচ বা হ্যান্ডেলের উপর চাপ দিলেই নেমে আসবে ছোরাগুলো...

বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো।

একটা কঠিন কণ্ঠ ভেসে এলো তার কানে।

বনহুর মাথা তুলতে না পারলেও ঘাড়টা একটু কাৎ হয়ে তাকালো। যেদিক থেকে শব্দটা আসছে সেইদিকে।

একটা ছায়ামূর্তি নজরে পড়লো বনহুরের।

ঠিক যেন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলছে। তার মুখমন্ডল স্পষ্ট দেখা না গেলেও আকার কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। লোকটার মাথায় ক্যাপ আছে, চোখে চশমা, দেহে ওভারকোট, তবে পা পর্যন্ত নজরে পড়লো না।

কঠিন গম্ভীর কণ্ঠস্বর—আমি কে জানো না! জানলে আমার পিছু লাগতে না। এবার বুঝতে পারবে মজাটা কেমন?

বনহুর বললো—তুমি কে আমার জানার কোনো প্রয়োজন নেই। মজাটা কেমন তা আমি যেমন টের পাচ্ছি, তুমিও তেমনি পাবে, তার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো।

যেন কানফাটা আওয়াজ।

হাসি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় কঠিন কণ্ঠস্বর— এই মুহূর্তে তোমার মৃত্যু হবে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখো। ঐ ছোরাগুলো এক্ষুণি তোমার দেহটাকে ঝাঁঝরা করে দেবে। তবু তুমি একটু ভয় পাচ্ছো না?

বললো বনহুর—মোটেই আমি ভয় পাই না। ঐ ছেরাগুলোকেও আমি তোয়াক্কা করি না।

ওঃ তুমি দেখছি বড় সাহসী......

শুধু সাহসী নই, দুঃসাহসী বলতে পারো।

তাহলে এক্ষুণি তোমাকে সায়েস্তা করতে হয়। লোকটার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার দক্ষিণ হাতখানা পাশের একটা হ্যান্ডেলের দিকে এগিয়ে গেলো।

বনহুর ছায়ার মধ্যেই লক্ষ্য করলো লোকটা হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে।

তাকালো বনহুর ছাদের দিকে।

হ্যান্ডেল ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে ছাদটা নামতে শুরু করলো নিচের দিকে। সূতীক্ষ্ণ ধার ছুরিসহ ছাদটা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে। কী ভয়ংকর সেই ছাদটা!

বনহুর বারবার চেষ্টা করতে রাগলো, হাত-পা ছাড়িয়ে নেবার জন্য কিন্তু লৌহশিকল বাঁধা থাকায় একটুও নড়তে পারছে না সে।

নেমে আসছে ছাদখানা।

বনহুর বুঝতে পারলো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দেহখানা ঐ সূতীক্ষ্ণধার ফলকে বিদ্ধ হবে। হাত-পা, এমন কি মাথাটাও তার বাধা রয়েছে, কাজেই উদ্ধার নেই কোনোরকমে। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও বনহুর ভেঙে পড়লো না। সে বললো—বন্ধু, আমাকে এভাবে হত্যা করে কোনো লাভ হবে না, কারণ...

ওঃ তুমি দেখছি মৃত্যুমুখে পৌঁছেও নিজকে বাঁচাতে চাইছো!

বললো বনহুর—সে কথা মিথ্যা নয়। আমাকে হত্যা করে কোনো লাভ হবে না, বরং তুমি নিজের বিপদ টেনে আনছো।

বিপদ হাঃ হাঃ হাঃ তোমাকে হত্যা করলে বিপদ হবে আমার। তবে হাঁ, তোমার জীবন আমি রক্ষা করতে পারি যদি একটা কথা দাও।

বললো বনহুর—কি কথা চাও তুমি বন্ধু?

বললো ছায়ামূর্তি—কথা দিতে হবে যদি আমাদের কাজে সহায়তা করো!

আগে জীবন বাঁচাও! বললো বনহুর।

উপরের সূতীক্ষ্ণধার ছোরাগুলো বুকের কাছাকাছি নেমে এসেছে। লোকটা তখনও হ্যান্ডেল ঘোরাচ্ছে।

একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে কটকট করে।

বনহুরের কথায় ছায়ামূর্তি হ্যান্ডেল ঘেরানো থেকে ক্ষান্ত হলো বলে মনে হলো। ভেসে এলো সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর—বেশ আমি তোমাকে এই মুহূর্তে মৃত্যু থেকে মুক্তি দিলাম।

ধন্যবাদ বন্ধু!

ছাদটা এবার উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে।

বনহুর নিঃশ্বাস নিলো প্রাণভরে। আর একটু হলেই ঐ ছোরাগুলো বিদ্ধ হতো তার দেহে এবং মৃত্যু ঘটতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৃত্যুকে সে ভয় করে না— কিন্তু এখনও যে তার কাজ শেষ হয়নি।

বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো।

ছায়ামূর্তির কঠিন কণ্ঠ একটু নরম মনে হলো, বলছে সে—কি ভাবছো?

না, কিছু না। এবার হাত-পা-মাথাটা মুক্ত করে দাও বন্ধু।

শোনো শক্তিশালী পুরুষ! হাঁ, তোমার নাম আমি শক্তিপুরুষ রাখলাম, কারণ তুমি যেভাবে আমার অনুচরদেরকে উপর ঘায়েল করেছো তাতে আমি

তোমাকে যান্ত্রিক মানুষ বলে মনে করেছি, কারণ আমার অসাধারণ শক্তিশালী অনুচর সুরুজ মাইথীকে তুমি হত্যা করেছো।

সুরুজ মাইথী!

হাঁ, তার মত শক্তিশালী অনুচর আমার কমই ছিলো। তুমি তাকে হত্যা করেছো কাজেই হয় তোমাকে জীবন দিতে হবে, নয় তো সুরুজ সাইথীর আসন তোমাকে পূরণ করতে হবে। বলো কোন্‌টায় তুমি রাজি?

বনহুর বললো—যেটা তুমি আমার জন্য ভাল মনে করো সেটাতেই আমি রাজি!

যদি হত্যা করি?

উপকৃত হবে না বরং বিপদ আসবে।

যদি তোমার জীবন দান করি?

তাতে তোমার মঙ্গল হবে, কারণ আমার দ্বারা তোমার অনেক কাজ সমাধা হতে পারে।

হাঁ, সে কারণেই আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। ছায়ামূর্তি অপর একটা সুইচে টিপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের হাত-পা এবং মাথার বাঁধন খুলে গেলো।

বনহুর চক্রাকার তক্তা থেকে নেমে দাঁড়ালো।

তাকালো সে সম্মুখ দিকে পর্দার আড়ালে ছায়ামূর্তিটার দিকে।

ছায়ামূর্তি অপর এক সুইচে হাত রাখলো।

দেখলো বনহুর তার চারপাশে একটা বেষ্টনী তাকে ঘিরে ধরেছে তবে একেবারে কাছাকাছি নয়, বেশ কয়েক হাত দূরে।

বনহুরের হাত-পা এবং মাথায় এমন কঠিনভাবে আটকানো ছিলো যে, হাতে-পায়ে এবং কপালে লাল দাগ হয়ে গিয়েছিলো।

হাতে-পায়ে হাত বুলিয়ে নিলো বনহুর।

এমন সময় ছায়ামূর্তির কণ্ঠের গম্ভীর আওয়াজ—মুক্তি হলেও তুমি বন্দী।

তা দেখতেই পাচ্ছি।

যদি আমাদের শপথপত্রে স্বাক্ষর করো তাহলে তুমি মুক্তি পাবে।

শপথপত্রে স্বাক্ষর?

হাঁ। তোমাকে স্বাক্ষর করতে হবে।

বেশ, রাজি।

তবু তোমাকে একেবারে আমরা মুক্ত করে দেবো না।

যা তোমাদের খুশি তাই করো, আমি রাজি, তবে......

তোমার কোনো শর্ত আমরা মেনে নেবো না।

বনহুর চেয়ে আছে ছায়ামূর্তির দিকে।

ছায়ামূর্তি পা দিয়ে কোনো এক বস্তুর উপর চাপ দিলো, অমনি সে নিরুদ্দেশ হলো তার আসন থেকে।

বনহুর বিস্মিত হলো।

লোকটা এই দলের সর্দার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অতি বুদ্ধিমান সে, নিজ আসনের চারপাশে নানা ধরনের মেশিন এবং কলকব্জা ঠিক করে রেখেছে। যখন যেটা তার প্রয়োজন ব্যবহার করছে।

বনহুর যখন কথাগুলো ভাবছে তখন হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠ ভেসে আসলো, সুন্দর ইংরেজি ভাষায় বললো বীর পুরুষ, ধন্যবাদ গ্রহণ করো।

বনহুর চমকে না উঠলেও আশ্চর্য দৃষ্টি নিয়ে তাকালো যেদিক থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এলো সেইদিকে। দেখলো একটা তরুণী বীণা হাতে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে।

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকালো। তরুণীর চোখেমুখে উচ্ছ্বাসভরা দৃষ্টি। বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—কি দেখছো এমন করে।

বনহুর বললো—আপনাকে।

ও, আমাকে দেখছো এমনভাবে?

হ্যাঁ।

দেখো আমি একজন মেয়েমানুষ। আমাকে অমন অবাক চোখে দেখবার কিছু নেই। আমি এসেছি শুধু তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে, কারণ তুমি অসাধারণ বীর পুরুষ......

বললো বনহুর—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তুমি নিজে নিজকে বীর পুরুষ বলে মনে করো তাহলে?

নিশ্চয়ই। যা সত্য তা অস্বীকার করি না। আপনার হাতে ওটা কি?

বীণা। গান শুনতে চাও?

বন্দীর আবার গান শোনা। চারিদিকে আমার বেষ্টনী, আমি যে বন্দী......বললো বনহুর।

যদি শপথপত্রে স্বাক্ষর করো তাহলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো।

পারবেন আমাকে মুক্ত করতে?

কেন পারবো না?

আমি যে অপরাধী, কারণ আপনাদের বিনা অনুমতিতে আপনাদের আস্তানায় প্রবেশ করেছি। তা ছাড়াও হত্যা করেছি আপনাদের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে তবে এ অপরাধ আমার ইচ্ছাকৃত নয়।

জানি! তরুণী বীণার ঝংকার তোলে, সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক একটা অদ্ভুত ধরনের খাতা আর কলম নিয়ে হাজির হলো।

অপর এক সুইচে পা দিয়ে চাপ দিলো তরুণী, অমনি বেষ্টনী সরে গেলো।

বনহুর মুক্ত।

তরুণী লোকটার দিকে ইংগিত করলো।

লোকটা এগিয়ে গেলো বনহুরের দিকে।

তরুণী বললো—স্বাক্ষর করো এই খাতায়! শোনো, তুমি যখন ঐ খাতায় স্বাক্ষর করবে তখন তোমার স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছবি উঠে যাবে এবং তুমি চিরজীবনের জন্য আমাদের দলে দলভুক্ত হয়ে পড়বে।

বনহুর শুধুমাত্র একটু শব্দ উচ্চারণ করলো—হুঁ।

কি, রাজি?

বনহুর বললো—রাজি!

তরুণী বীণার ঝংকার তুললো।

লোকটা বনহুরের স্বাক্ষর নেবার জন্য খাতাখানা মেলে ধরলো তার সামনে।

এদিকে যখন তরুণী বনহুকে বিস্ময়কর খাতায় স্বাক্ষর করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো, তখন অপর এক কক্ষে সেই অদ্ভুত ছায়ামূর্তি একটা টেলিভিশন পর্দার সামনে বসে সব লক্ষ্য করছিলো। বনহুর আর তরুণীর কথাবার্তা সব শুনতে পাচ্ছিলো সে।

লোকটা কে কেউ জানে না।

মুখখানা তার কালো রুমালে ঢাকা।

এমন কি তার মাথাটাও কারও নজরে পড়ে না। ছায়ামূর্তির মুখখানা মুখোশের আড়ালে ঢাকা। সে স্থির হয়ে দেখছে, তার ডান হাতখানা পাশের কয়েকটি বোতামের উপর রয়েছে। বোতাম টিপলেই সম্মুখস্থ টেলিভিশন পর্দার আলো নিভে যাবে!

ছায়ামূর্তি দেখলো তরুণীর কথায় বন্দী উদ্বুদ্ধ হয়েছে। সে স্বাক্ষর করতে হাত বাড়িয়েছে তার অনুচরদ্বয়ের দিকে।

ছায়ামূর্তির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো।

সে কোনো এক কুমতলব এঁটেছে, সেটাকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্যই তার এত প্রচেষ্টা। যে খাতাখানায় স্বাক্ষর গ্রহণ করতে যাচ্ছে ওটা তো সাধারণ খাতা নয়। ওর মধ্যে আছে ক্যামেরা এবং টেপরেকর্ড।

অবশ্য বনহুর জানে ঐ খাতায় স্বাক্ষর করলে তার কোনো না কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে। হাত বাড়িয়ে স্বাক্ষর করতে গেলেও আসলে বনহুর খাতায় স্বাক্ষর করবে না কোনো রকমে। ওটা তার কৌশল ছাড়া কিছু নয়।

তরুণী বীণায় ঝংকার তুললো।

লোকটা খাতা সহ বনহুরের কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই বনহুর খাতাখানা ছিনিয়ে নিয়ে প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো তার নাকে।

লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো।

বনহুর ফিরে দাঁড়াতেই দেখলো বীণাধারিণী তরুণী উধাও হয়েছে, তার চারপাশে বেষ্টনী উঠে গেলো সেই মুহূর্তে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়া লোকই ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে অট্টহাসি হেসে উঠলো—তুমি ভেবেছিলে আমাকে কাবু করে ওটা নিয়ে পালাবে কিন্তু তা হবে না...

বনহুর ওর কথায় কোনো জবাব দিলো না। সে হস্তস্থিত খাতাটার উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুঝতে পারলো ওটা একটা বিস্ময়কর বস্তু। ওটাকে হাতছাড়া করা যায় না, যেমন করে হোক ওটাকে নিতে হবে তার।

বললো বনহুর—যদি ক্ষমতা থাকে এটা ছিনিয়ে নাও।

ওঃ তুমি দেখছি রণকৌশল এটেছো? জানো না তোমার কোনো কৌশল এখানে চলবে না। এই মুহূর্তে তোমাকে হত্যা করা হবে....

বনহুর কোনো জবাব দিবার পূর্বেই লোকটা পা দিয়ে মেঝের এক স্থানে চাপ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের চারপাশে বেষ্টনী ক্রমান্বয়ে ছোট্ট হয়ে আসতে লাগলো।

বললো লোকটা—যদি বাঁচতে চাও তাহলে ওটা আমাকে ফেরত দাও নইলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য।

বনহুর বললো—মৃত্যুকে আমি ভয় করি না।

বনহুর আর ঐ লোকটার সঙ্গে যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন ছায়ামূর্তি তার নিজ কক্ষে বসে টেলিভিশন পর্দায় সব দেখতে পাচ্ছিলো।

এবার বনহুর শুনতে পেলো পূর্বের সেই কণ্ঠস্বর— এখানে এসে কেউ কোনোদিন জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারেনি। তুমি ফিরে যাবে এটা ভেবো না বন্দী! তুমি ঐ খাতা ফিরিয়ে দাও।

বনহুর হেসে বললো—যদি আমার বেষ্টনী মুক্ত করে দাও তাহলে এটা আমি দিয়ে দেবো।

বেশ, তাই দিচ্ছি। শব্দটা ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপলো ছায়ামূর্তি।

অমনি বেষ্টনী মুক্ত হলো।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে তরুণী। হাতে তার বীণা।

বনহুর পাশে এগিয়ে গেলো, বললো সে—শুনবে? আমার বীণার ঝংকার শুনবে তুমি?

বনহুর বললো—বাজাও।

আমাকে তুমি, তুমি বললে?

হাঁ, তুমি আমার একান্ত আপনজন, তাই....

বেশ, তুমিই বলো। তরুণী বীণার ঝংকার তুললো।

বনহুর মুগ্ধ হলো।

অপূর্ব সে সুরের ঝংকার।

মুগ্ধ নয়নে বনহুর এগিয়ে আসছে তার দিকে।

যে লোকটা ঐ বিস্ময়কর খাতা নিয়ে বনহুরের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলো, সে উধাও হয়েছে।

তরুণী বীণা বাজাচ্ছে।

বনহুরের হাতে রয়েছে সেই খাতাখানা।

তরুণীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বনহুর।

বীণার ঝংকার এক সময় থেমে যায়। হাত বাড়ায় সে বনহুরের দিকে খাতাখানা নেবার জন্য।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুর তরুণীকে হঠাৎ তুলে নেয় কাঁধে, তারপর দ্রুত সম্মুখ পথ ধরে ছুটতে থাকে। এ পথ যেন তার চেনা।

বনহুর মুহূর্তে বেরিয়ে আসে সম্মুখ পথ দিয়ে।

দরজার উপরিভাগে দাঁড়িয়ে যে লোকটা সুইচ টিপছিলো আসলে সে রহমান। ছদ্মবেশে ছিলো সে, তাই তাকে শয়তান দলের কেউ চিনতে পারেনি।

সুইচ টিপতেই দরজা খুলে গেলো।

বনহুর তরুণী সহ বেরিয়ে এলো বন্দীশালা থেকে।

এবার রহমান নিজেও এসে যোগ দিলো।

বনহুর রহমানকে দেখামাত্র চিনতে পারলো এবং বুঝতে পারলো রহমানই তার বন্দীশালার পথ মুক্ত করে দিয়েছে।

রহমান সম্মুখদিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—ঐ পথে চলুন সর্দার, আমাদের জন্য অশ্ব অপেক্ষা করছে, কিন্তু।

বনহুর বুঝতে পারলো রহমান তার কাঁধে তরুণী সম্বন্ধে কিছু বলতে চাচ্ছে তাই সংক্ষেপে বলে উঠলো—ওর প্রয়োজন আছে।

কথা শেষ না করেই বনহুর আর রহমান দৌড়াতে লাগলো।

বনহুরের কাঁধে বীণাবাদিকা তরুণী হাত-পা ছুড়ছে।

বীণাখানা সে ছুড়ে ফেলে দেয়নি বা হাতছাড়া করেনি। হাত পা ছুড়লেও তরুণী বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেলো না।

বনহুর আর রহমান যখন দ্রুত দৌড়াচ্ছিলো তখন তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো কয়েকজন সূতীক্ষ্ণ ধার অস্ত্রধারী যোয়ান।

পথরোধ করে দাঁড়ালো ওরা।

বনহুর আর রহমান থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। শুরু হলো ভীষণ লড়াই।

বনহুর কিন্তু তরুণীকে হাতছাড়া করলো না, সে ওর একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরে ডান হাতে প্রতিরোধ করে চললো, ঘুসির পর ঘুসি চালিয়ে চললো সে, কেউ তার দেহ স্পর্শ করতে পারলো না।

কাউকে ঘুসি, কাউকে পদাঘাত, কাউকে প্রচন্ড ধাক্কা। দ্রুত বনহুর সবাইকে কাবু করে ফেললো।

রহমান পাশের টেবিল থেকে একটা বড় বোতল তুলে নিয়ে টেবিলের পাশে আঘাত করলো, সঙ্গে সঙ্গে বোতলটা দ্বিখন্ডিত হলো। সেই দ্বিখন্ডিত বোতল নিয়ে রহমান ভীষণভাবে আক্রমণ করলো শত্রুপক্ষকে।

তুমুল লড়াই।

ঠিক ঐ সময় ছায়ামূর্তি দরজার মুখে এসে দাঁড়ালো। তার মুখোশ, দেহে বিস্ময়কর পোশাক, হাতে একটা অদ্ভুত অস্ত্র। মুখোশের মধ্য দিয়ে চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলছে।

ছায়ামূর্তিকে দেখামাত্র চিনতে পারলো বনহুর। ঐ লোকটাই তাকে কৌশলে বন্দী করে এবং চক্রাকার তক্তার সঙ্গে লৌহ শিকলে আবদ্ধ করেছিলো। চিনতে মোটেই ভুল হয় না বনহুরের।

এবার বনহুর বুঝতে পারে, এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বড় শক্ত। তাই সে প্রস্তুত হয়ে নিলো এবং রহমানকে বললো—রহমান, একে কাবু করতে হবে, ঠিকমত প্রস্তুত হয়ে নাও। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার বের করে গুলী ছুড়লো বনহুর অদ্ভুত পোশাকপরা লোকটার দিকে।

গুলী তার বুকে বিদ্ধ হবার পূর্বেই সে দ্রুত সরে দাঁড়ালো এবং তার নিজ হাতের অস্ত্র ব্যবহার করার জন্য উদ্যত করলো অস্ত্রখানা।

তরুণী চিৎকার করে বললো—সর্বনাশ, আমাকে হত্যা করোনা ভাস্কর মাইথী আমাকে হত্যা করো না...

লোকটার নাম ভাস্কর মাইথী বুঝতে বাকি রইলো না বনহুরের এবং ভাস্কর মাইথীর হাতের অস্ত্রখানা ভয়ংকর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তরুণী জানে, যদি ভাস্কর মাইথী তার হস্তস্থিত অস্ত্রখানা চালু করে তাহলে সেও রক্ষা পাবে না। সেই কারণেই তরুণী উদ্বিগ্ন ভীতকণ্ঠে চিৎকার করে বললো—আমাকে হত্যা করো না ভাস্কর মাইথী।

কিন্তু ঐ মুহূর্তে ভাস্কর মাইথীর মনের অবস্থা মোটেই স্থির ছিলো না। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো। ভাববার সময় পেলো না, হস্তস্থিত অস্ত্র দ্বারা সবাইকে নিঃশেষ করে ফেলার জন্য অস্ত্র উদ্যত করে ধরলো।

অস্ত্রটা অত্যন্ত মারাত্মক।

অস্ত্রটা চালু করবার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু যা অস্ত্রের সম্মুখে পড়বে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। বিস্ময়কর অস্ত্রটা উদ্যত করে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী বীণাসহ হাত দু'খানা উঁচুতে তুলে ধরে আর্ত চিৎকার করে উঠলো।

বনহুর নিজেও হতভম্ব হয়ে গেছে।

রহমান বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যারা এতক্ষণ বনহুর আর রহমানকে আক্রমণ করেছিলো, তারা সবাই মুহূর্তে সরে পড়েছে সেখান থেকে।

বনহুর লক্ষ্য করছিলো ছায়ামূর্তি অস্ত্র হাতে যেমনি আবির্ভূত হয়েছে, অমনি সকলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো, তারা যে যেদিকে পারলো দ্রুত সরে পড়লো। বনহুর তাই বুঝতে পারলো ভাস্কর মাইথীর হাতের অস্ত্র মারাত্মক।

ভাস্কর মাইথী তার হস্তস্থিত অস্ত্র উঁচু করে ধরতেই তরুণীর কানফাটা আর্তচিৎকার, তার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়কর এক কান্ড। ভাস্কর মাইথী নিজ অস্ত্র চালু করবার পূর্ব মুহূর্তেই তার পৃষ্ঠদেশে এসে বিদ্ধ হলো একটা তীরফলক। ভীষণ এক আর্তচিৎকার করে উঠলো ভাস্কর মাইথী, তারপর ঢলে পড়ে গেলো।

বনহুর লক্ষ্য করলো তীর-ধনু বাইরের দিক থেকে এসেছে। ভাববার তার সময় নেই, তরুণীকে পুনরায় বনহুর জোর পূর্বক কাঁধে তুলে নিলো।

কিন্তু বড় আশ্চর্য, তরুণী এখনও বীণা হাতছাড়া করেনি। বীণাখানাকে সে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

রহমান বনহুরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

দু'চারজন যারা বাধা দিলো তাদের সবাইকে কাবু করলো রহমান, কারণ তার হাতে ছিলো গুলীভরা রিভলভার।

বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে সোজা বনহুর আর রহমান মুক্ত রেলিংয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো। নিচে হোটেল।

বনহুর দোতলার রেলিংয়ের উপর এসে দাঁড়ালো।

তার পেছনে রহমান।

বনহুরের কাঁধে হাত-পা ছুড়ছে তরুণীটা।

বনহুরের কানে রহমান কিছু বললো।

শিস দিলো বনহুর।

অমনি অশ্ব তাজ আর দুলকী এসে হাজির হলো নিচে।

বনহুর আর রহমান মুহূর্ত বিলম্ব না করে নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে পড়লো।

বনহুর কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে পড়বার সময়ও তরুণীকে ঠিকভাবে ধরে রেখেছিলো। কাজেই তরুণীটা বনহুরের কবল হতে মুক্ত হতে পারলো না।

তাজ আর দুলকী উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

বনহুর তরুণীকে শক্ত করে ধরে রেখেছে।

রহমানের অশ্ব তাজের পেছনে।

❑

হীরা পর্বতের পাদমূলে একটা নির্জন স্থান।

তরুণীর হাতখানা পিছমোড়া করে বাঁধা, তার বীণাখানা রয়েছে সম্মুখে একটা পাথরখন্ডের উপর।

বনহুর আর রহমান অশ্ব দুটিকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে কথা বলছিলো তরুণীর সঙ্গে।

তরুণীর চোখেমুখে ক্রুদ্ধভাব।

বনহুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, পাশে রহমান।

বনহুর বললো—বলো কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি আমার সামনে উপস্থিত হয়েছিলে?

তরুণী বললো—তোমরা আমাকে কি উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে এলে, আগে তাই বলো?

ওঃ তুমি দেখছি অত্যন্ত চালাক মেয়ে। আগে আমাদের উদ্দেশ্য জানতে চাও?......

হাঁ, আগে তোমাদের উদ্দেশ্য বলো?

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকালো তরুণী চোখ দু'টোর দিকে। তরুণীর দুচোখে বুদ্ধিদীপ্ত ভাব ফুটে উঠেছে, সে যে অসাধারণ চতুর তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর বললো এবার—শোনো তরুণী, তোমাকে এখানে নিয়ে আসার পেছনে রয়েছে গভীর রহস্য উদঘাটন।

গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন।

হাঁ।

কি সে গভীর রহস্য?

হীরার প্রেসিডেন্ট-কন্যা নিখোঁজ রহস্য উদ্‌ঘাটন ব্যাপারে তোমার সহযোগিতা চাই......

তরুণীর দু'চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হলো। বললো—প্রেসিডেন্ট কন্যা নিখোঁজ রহস্যের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

মিথ্যা কথা, তুমি সব জানো। আর তোমাকেই মিস মিনারা মির্জার অন্তর্ধান সম্বন্ধে সবকিছু আমাকে জানাতে হবে।

তরুণী ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত গর্জে উঠলো—না, আমি কিছু জানি না।

আবার মিথ্যা কথা?

কোনোদিনই তোমরা মিস মিনারা মির্জার সন্ধান পাবে না, পেতে পারো না।

হাঃ হাঃ হাঃ...অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—তোমার দ্বারাই আমি মিস মিনারা মির্জার পথের সন্ধান চাই...হাঁ, আর একটি কথা, তোমাকে বলতে হবে কে ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের নেতা হিসেবে কাজ করছিলো? যাকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করা হলো কে সে ব্যক্তি ছিলো? অবশ্য নাম তার জেনে নিয়েছি—ভাস্কর মাইথী...

সেটাই তার পরিচয়।

না, ওটা তার ছদ্মনাম, আসল পরিচয় জানতে চাই?

রহমান বলে উঠলো—সর্দার, ওর পরিচয় আমি জেনে নিয়েছি। ভাস্কর মাইথী মহারাজ হিরুনাথ শর্মা।

হিরোসিমার সেই পলাতক মহারাজ হিরুনাথ শর্মা?

হাঁ সর্দার।

শেষ পর্যন্ত মহারাজ হিরুনাথ শর্মা হীরা নগরীর বুকে গোপন আড্ডা গেড়ে জনগণের সর্বনাশ করে চলেছে।

শুধু জনগণের সর্বনাশ নয় সর্দার, ঐ নরপশু সমস্ত জাতির সর্বনাশ করে চলেছে। শুধু হীরা নগরীই নয়, সমস্ত পৃথিবীর সর্বনাশ সে করেছে। পৃথিবীর বহু স্থানে ওর গোপন আস্তানা আছে। স্মাগলারের সর্দার সে, গোটা বিশ্ব সে নিজ আয়ত্তে রেখেছিলো।

রহমানের কথাগুলো তরুণী যেন গিলছিলো।

বনহুর বললো—রহমান, তুমি এত অল্প সময়ে হীরানগীর সব কিছু গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছো, এটা বড় বিস্ময়কর বটে। কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময়কর ভাস্কর মাইণী মানে হিরু নাথ শর্মার পিঠে তীরবিদ্ধ করা।

হাঁ সর্দার, কল্পনাতীত বটে! একটু থেমে বললো রহমান—

আশ্চর্য, ঐ মুহূর্তে তীরফলকটা এসে যদি ভাস্কর মাইথীর পিঠে বিদ্ধ না হতো তাহলে......

রহমানের কথা শেষ না হতেই বললো তরুণী—ভাস্কর মাইথীর হাতে যে মারাত্মক অস্ত্রটি ছিলো তার সুইচ টিপলেই শুধু তোমাদের মৃত্যু ঘটতো না, আমিও তোমাদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতাম।

বললো বনহুর—তীরফলকের গভীর রহস্য আমাকে বিস্মিত করেছে।

রহমান বললো—সর্দার, আমিও আশ্চর্য হয়ে গেছি। এই সুদূর হীরানগরীর কোনো গোপন স্থানে কি করে তীর নিক্ষেপ কারী প্রবেশ করলো এবং কি করে সে ঠিক ঐ মুহূর্তে ভাস্কর মাইথীকে নিহত করে আমাদের বিপদমুক্ত করলো......

সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার।

তরুণী বললো তীর নিক্ষেপকারীর সন্ধান আমি জানি!

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বললো—শুধু তীর নিক্ষেপকারীর সন্ধান নয়, তুমি সব কিছুর সন্ধানই জানো। সুন্দরী, যদি নিজকে রক্ষা করতে চাও তাহলে মিস মিনারা মির্জার উদ্ধারের উপায় আমাকে বলে দাও, নইলে...বনহুর কথা শেষ না করেই বীণাখানা তুলে নিলো হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে তরুণী আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো—না না, বীণা স্পর্শ করো না...ওটা আমাকে দাও ওটা আমাকে দাও।

বনহুর বীণাখানা উঁচু করে ধরে বললো—যতক্ষণ না আমার কথায় রাজি হয়েছো ততক্ষণ তুমি এ বীণা ফেরত পাবে না। আমি এটা ভেঙে খন্ড খন্ড করে ফেলবো।

তরুণী বলে উঠলো—ওটা আমাকে ফেরত দাও, আমি তোমাকে মিস মিনারা মির্জার পথের সন্ধান বলে দেবো।

না, তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেখানে। কঠিন কণ্ঠে বললো বনহুর। একটু থেমে পুনরায় বললো সে—তার পূর্বে তোমাকেই উদঘাটন করতে হবে তীরফলকের গভীর রহস্য...

বনহুর কথা শেষ করে বীণাখানা ছুড়ে মাটিতে ফেলতে গেলো, অমনি তরুণী আর্তনাদ করে উঠলো—আমাকে একটু সময় দাও, আমি বলছি।

বনহুর বীণা সহ হাতখানা নিচে নামিয়ে নিয়ে বললো—বলো?

তীর নিক্ষেপকারী আমাদের দলের লোক নয়, সে এক তরুণ। জানি না কে সে। তবে হীরা নগরীরর বুকে তার তীরফলক নিক্ষেপ অবিরতই ঘটে চলেছে। আমি তাকে দেখেছি।

তীর নিক্ষেপকারী এক তরুণ?

হাঁ, বললো তরুণী।

বনহুরের ভ্রুজোড়া কুঞ্চিত হলো, তাকালো সে রহমানের মুখের দিকে।

পরবর্তী বই
সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে

সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে—১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক
দস্যু বনহুর

বীণাখানা বনহুর হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখলো, তারপর হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো—জানি এই বীণার মধ্যে তোমার পরম সম্পদ রয়েছে কিন্তু তুমি তা পাবে না যতক্ষণ না তুমি আমাকে মিস মিনারা মির্জার সন্ধান দিচ্ছো।

বনহুরের কথায় তরুণীর মুখমন্ডল ফ্যাকাশে ও বিমর্ষ হয়ে উঠলো, বললো সে—আমি সব বলবো তোমাকে তুমি আমার বীণা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

সত্যি শপথ করে বলছো?

হাঁ।

বেশ, তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি, মনে রেখো কোনো রকম চালাকি করতে গেলে...

আমি এখন হতে তোমাদের দলে এলাম। তুমি আমার বন্ধু...

বনহুর তাকালো রহমানের মুখের দিকে, ইংগিতে তরুণীর হাতের বাঁধন খুলে দিতে বললো।

তরুণীর হাত দু'খানা এতক্ষণ পিছমোড়া অবস্থায় বাঁধা ছিলো, রহমান মুক্ত করে দেওয়ায় তরুণী হাত দু'খানা প্রসারিত করে দাঁড়ালো—দাও, আমার বীণা আমাকে ফিরিয়ে দাও?

বনহুর বললো—দেবো কিন্তু এখন নয়, মিস মিনারা মির্জার উদ্ধারের পর।

তরুণী নির্ণিমেষ নয়নে তাকালো বনহুরের চোখ দুটোর দিকে। অপূর্ব দীপ্ত সে চোখ, সহসা তরুণী দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না, স্থিরকণ্ঠে বললো—বেশ, তাই হবে।

রহমান বললো—সর্দার!

বনহুর তাকালো রহমানের মুখের দিকে।

বললো রহমান—বিলম্ব করা আর ঠিক হবে না।

তাহলে চলো তরুণী, তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো। আচ্ছা, তোমার নাম?

বললো তরুণী—নাম বার্বারা। এই নাম আমার আসল নাম।

তাহলে তোমার আরও নাম আছে বা ছিলো?

হাঁ, একটা নয়, পাঁচটা নাম আমার। কারণ এক এক আসরে এক এক নামে আমি পরিচিতা।

মিস্ না মিসেস বার্বারা?

মিস বার্বারা।

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে বললো—ওঃ।

তরুণী হাত বাড়িয়ে বললো—বীণা দাও।

বনহুর বীণাখানা রহমানের হাতে দিয়ে বললো—রহমান, যতক্ষণ না মিস বার্বারা আমাকে মিস মিনারার মির্জার সন্ধান দিচ্ছে ততক্ষণ এ বীণা তোমার হেফাজতে থাকবে।

রহমান সর্দারের হাত থেকে বীণাখানা গ্রহণ করলো।

বনহুর বললো—বীণা পাবে। এবার এসো মিস বার্বারা, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

মিস্ বার্বারা দেখলো বীণা এ মুহূর্তে পাবার কোনো আশা নেই, তাই সে বনহুরের দিকে পা বাড়ালো।

বনহুর শিষ দিতেই অশ্ব তাজ এসে পড়লো, এতক্ষণ সে দুলকীর ঘাস খেতে ব্যস্ত ছিলো। প্রভুর আহ্বানে চঞ্চলভাবে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর পুনরায় শিষ দিতেই দুলকী চলে এলো।

বনহুর দুলকীর পিঠ চাপড়ে বললো—আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। রাজি?

দুলকী মাথা দুলালো।

বনহুর হেসে বললো—রহমান, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা করো। তারপর মিস বার্বারার দিকে তাকিয়ে বললো—এই অশ্বটাকে তোমার জন্য নিলাম, এটাকে আপাতত তুমি ব্যবহার করতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, মিস বার্বারা, কোনো রকম...

মিস বার্বারা ততক্ষণে অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসেছে।

বনহুর উঠে বসলো তাজের পিঠে।

রহমান দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগলো।

দুলকী পৃষ্ঠে তরুণী এগিয়ে চলেছে আর তাজের পিঠে চললো বনহুর।

হীরা পর্বত।

ঢালু দিক দিয়ে এগিয়ে চললো তরুণী।

বনহুর তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

পথ কোনো স্থানে খাড়া কোনো স্থানে ঢালু, তাই অশ্ব কোনো স্থানে এগুচ্ছিলো কোনো স্থানে ধীরে চলছিলো।

বেশ সময় লেগে গেলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে জমাট বেধে উঠলো।

মিস বার্বারার অশ্ব অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

বনহুর ইচ্ছা করেই কিছুটা পিছিয়ে পড়ছিলো, সে লক্ষ্য করছিলো তরুণী তাকে ভুলপথে নিয়ে যাচ্ছে না তো।

পর্বত বেয়ে অশ্ব বেশি উপরে উঠতে পারলো না।

তরুণী নেমে পড়লো।

বনহুরও নামতে বাধ্য হলো, না নেমে কোনো উপায় ছিলোনা।

তাজ ও দুলকীকে রেখে বনহুর আর তরুণী পায়ে হেঁটে অগ্রসর হলো।

বললো তরুণী—পথ বড় দুর্গম!

বনহুর হেসে বললো—দুর্গম পথ অতিক্রম করাই আমার কাজ।

তবে এসো আমার সঙ্গে। তরুণী বললো।

অনেকটা উঁচুতে উঠে আসার পর তরুণী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

চারপাশে পর্বতচূড়াগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেন এক একটা সজাগ প্রহরী।

বনহুর একটু বিস্মিত হচ্ছে, কারণ তরুণীর হাবভাব কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হলো। বনহুর ফিরে তাকাবার পূর্বেই তার মাথার উপরে নেমে এলো একরাশ মাকড়সার জাল।

মুহূর্তে বনহুর বুঝে নিলো ব্যাপারটা।

সুচতুরা মিস বার্বারা তাকে কৌশলে ফাঁদে ফেলেছে। মজবুত রেশম কর্ডের জাল দ্বারা তাকে আটকে ফেলা হলো। তাজসমেত জড়িয়ে পড়েছে বনহুর জালের মধ্যে।

বনহুর একটু পরেই আঁচ করলো তার চারদিকে বেশ কয়েকজন অস্ত্রধারী তাকে ঘিরে ফেলেছে।

ততক্ষণে দুলকীর পিঠ থেকে নেমে পড়েছে মিস বার্বারা। সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট তার মুখ দেখা না গেলেও বনহুর বুঝতে পারলো সুচতুরা তরুণীর মুখে দুষ্টামির হাসি।

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে পড়েছে।

কিন্তু জাল থেকে মুক্ত হতে পারলো না।

তাজ চিঁহি-চিঁহি শব্দ করছে। আর সম্মুখ পা দু'খানা উঁচু করে জাল থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছে।

ওরা কৌশলে বন্দী করে ফেললো বনহুর আর তাজকে।

দুলকীর পিঠ থেকে মিস বার্বারা নেমে দাঁড়াতেই দুলকী বুঝতে পারে অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়, তাই সে সবার অলক্ষ্যে সরে পড়ে এবং সোজা গিয়ে হাজির হয় রহমানের সম্মুখে।

রহমান দুলকীকে শূন্য পৃষ্ঠে ফিরে আসতে দেখে বিস্মিত না হয়ে সব অনুধাবন করে নিলো। সে বুঝতে পারলো মিস বার্বারার চক্রান্তে সর্দার আটক হয়েছে, নাহলে দুলকী এভাবে ফিরে আসতো না!

রহমান সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়ালো, দুলকীর পিঠ চাপড়ে বললো—সর্দার আজ তাজ কোথায়? তাদেরকে কোথায় রেখে এলি দুলকী?

দুলকীর কথা বলার ক্ষমতা থাকলে সে সবকিছু খুলে বলতো কিন্তু সে বাকহীন। কিছু বলবার ক্ষমতা তার নেই, তাই সে শুধু চিঁহি শব্দ উচ্চারণ করলো।

রহমান পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো—আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে, বুঝলি?

দুলকী কি বুঝলো না বুঝলো সে কোনো জবাব দিলো না।

রহমান পাশে রক্ষিত বীণাখানা তুলে নিলো হাতে। উল্টে-পাল্টে দেখলো কিছুক্ষণ। হঠাৎ তার চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো, বীণার একপাশে ছোট্ট একটা সুইচ রয়েছে। রহমান বিলম্ব না করে সুইচে চাপ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো বীণার পেছন অংশের ঢাকনাটা।

রহমান বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো বীণার অভ্যন্তরে একটা ছোট্ট মেসিন। মেসিনটা সম্পূর্ণ নতুন এবং আশ্চর্যজনক। রহমানের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সে বীণার অভ্যন্তরে ছোট্ট মেশিনটার উপরে একটা চাকতি দেখতে পেলো। মোটেই বিলম্ব না করে সে চাকতিটার উপরে চাপ দিলো।

অমনি একটা বিস্ময়কর শব্দ ঐ বীণার মধ্য হতে বেরিয়ে এলো, সংকেতপূর্ণ শব্দ। তারপর একটা কণ্ঠস্বর...হীরা পর্বতের ঠিক দক্ষিণ ধারের পথ ধরে সোজা যাও। সম্মুখে একটা ধূসর রঙের পাথরখন্ড পাবে! দু' পাশে দুটো কালো পাথর। কোনো ক্রমে কালো পাথরে হাত দেবে না। ধূসর রঙের পাথরটাতে ধাক্কা দাও। একটা সুড়ঙ্গপথ পাবে। এই সেই সুড়ঙ্গপথ যে পথের সন্ধানে তুমি সাধনা করে চলেছো...তারপর কট্ কট্ করে অদ্ভুত

শব্দ হলো, রহমান বুঝতে পারলো কোনো লৌহদরজা খোলার শব্দ ওটা। তারপর সব বন্ধ হয়ে গেলো। আর কোনো শব্দই শোনা গেলো না।

রহমান নিশ্বাস বন্ধ করে একবার দু'বার তিনবার শুনলো তারপর দুলকীর পিঠে উঠে বসলো।

দুলকীর পিঠে উঠে বসবার পূর্বে রহমান বীণাখানাকে অতি যত্ন সহকারে লুকিয়ে রাখলো একটা গর্তের মধ্যে, তারপর গর্তটার মুখে পাথর চাপা দিলো। সর্দারের সন্ধান না নিয়ে সে অন্য কোনো দিকে মন দেবে না।

রহমান লাগাম চেপে ধরে বললো—দুলকী, কোথায় আছে সর্দার আর তাজ, সেখানে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্।

দুলকী পর্বতের পায়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলো। কিছুটা খাড়া, কিছু সমতল, পুনরায় ঢালু সেই দুর্গম পথ অতিক্রম এভাবে করে এমন এক স্থানে এসে দুলকী দাঁড়িয়ে পড়লো যেখানে চারপাশে পর্বত মালার সুইচ্চ শৃঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

এমন উঁচু স্থানে শুধু দুলকী আর তাজ ছাড়া কোনো অশ্ব উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ।

দুলকীর পিঠ থেকে নেমে পড়লো রহমান।

সর্দার এবং মিস বার্বারা চলে আসার পর একটা রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে, সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়েছিলো দুলকী কিন্তু তাজ আর ফিরে যায়নি। তাহলে কি তাও শত্রুহস্তে বন্দী হয়েছে? রহমান গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো একটা ছোট্ট বস্তুর উপর।

রহমান ডান হাতে তুলে নিলো।

বস্তুটা সর্দারের আংটি।

রহমান বুঝতে পারলো সর্দারকে শত্রুপক্ষ আটক করে ফেলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রহমান আংটিটাকে যত্ন সহকারে জামার পকেটে রাখলো। তারপর দুলকীকে লক্ষ্য করে বললো—দুলকী এখানে অপেক্ষা করবি যতক্ষণ আমি না ফিরে আসি।

দুলকী যেন প্রভুর কথাগুলো হৃদয় দিয়ে অনুভব করলো, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো সে রহমানকে।

রহমান আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পকেট থেকে বের করলো ক্ষুদে ওয়্যারলেসখানা, সুইচ টিপে তুলে ধরলো কানের কাছে। রহমান জানে না কি অবস্থায় কোথায় আছে সর্দার।

ক্ষুদে ওয়্যারলেস যন্ত্রটার সুইচ টিপতেই রহমানের কানে এলো একটা অদ্ভুত শব্দ। কেমন যেন উৎকট কট্ কট্ শব্দ। রহমান বুঝতে পারলো সর্দার যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার পকেটে বা দেহের কোনো অংশে ক্ষুদে ওয়্যারলেসখানা চালু করা আছে।

রহমান ওয়্যারলেসে মুখ রেখে কথা বললো—সর্দার, আমি রহমান কথা বলছি। আপনি কি অবস্থায় আছেন জানতে চাই?

কোনো জবাব আসে না ওপাশ থেকে।

রহমান ভীষণ ঘাবড়ে গেলো।

তবে কি সর্দারের কথা বলার কোনো পথ নেই। হয়তো তাকে এমনভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে যোর জন্য তিনি কথা বলতে পারছেন না।

রহমান আবার ওয়্যারলেসে মুখ রাখলো, সর্দার শুনতে পাচ্ছেন না কি? আমি রহমান কথা বলছি। সর্দার....সর্দার...

কোনো জবাব নেই।

রহমান মুষড়ে পড়লো, সে ওয়্যারলেসটা বন্ধ করে পকেটে রাখলো তারপর চলতে শুরু করলো।

রহমান চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হচ্ছিলো। হঠাৎ তার পেছনে একটা শব্দ হলো। চমকে ফিরে তাকালো রহমান, সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলো। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জমকালো পোশাকপরা এক ব্যক্তি।

রহমান ফিরে তাকাতেই জমকালো মূর্তি আক্রমণ করলো রহমানকে।

প্রস্তুত ছিলো রহমান, সে তার এক হাত দ্বারাই প্রতিরোধ করলো। বজ্রমুষ্ঠিতে ধরাশায়ী করলো জমকালো মূর্তিটাকে।

চললো ভীষণ যুদ্ধ।

হীরা পর্বতের প্রায় মাঝামাঝি যুদ্ধটা চলেছে। জমকালো মূর্তিটার দেহে ভীষণ শক্তি। রহমান প্রাণপথে লড়াই করে চলেছে।

একটু এদিক ওদিক হলেই মৃত্যু।

জমকালো মুর্তিটার মুখে মুখোস থাকায় তাকে চেনা না গেলেও রহমান বুঝতে পারছে লোকটা বেশ বয়স্ক। কারণ রীতিমত হাঁপাচ্ছিলো সে।

প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো রহমান লোকটার মাথা লক্ষ্য করে। অমনি লোকটা টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো এবং সে গড়িয়ে পড়তে লাগলো হীরা পর্বতের নিচের দিকে।

রহমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

গড়িয়ে যাচ্ছে জমকালো মূর্তিটার দেহ!

পাথরে পাথরে আঘাত খেয়ে থেতলে যাচ্ছে ওর দেহের মাংস আর হাড়গুলো।

যদিও রহমান ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো তবু না হেসে পারলো না। উপযুক্ত সাজা সে পেয়ে গেছে।

রহমান জানে সে আর উঠে আসতে পারবে না, কারণ পাথরে পাথরে আঘাত খেয়ে তার হাড়-মাংস গুলো হয়ে কাবাবের মাংসের মত তালগোল পাকিয়ে গেছে।

এবার নিশ্চিন্ত মনে সামনের দিকে এগুলো রহমান।

দুর্দান্ত সিংহের মত ফোঁস ফোঁস করছে রহমান। ভাবছে তার সর্দারকে কৌশলে বন্দী করা হয়েছে। মিস বার্বারার চক্রান্তে যে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রহমান দক্ষিণ হাতে অস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হলো।

ললাট বেয়ে ঘাম ঝরছে দর দর করে।

ক্ষাণিকটা এগুনোর পর রহমান থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলো এক জায়গায় কিছুটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

চমকে না উঠলেও রহমান শিউরে উঠলো, রক্তটা কার এবং কোথা থেকে এলো।

রহমান বুঝতে পারলো নিকটে কোথাও কোনো বিপদ ওৎ পেতে আছে। ভালভাবে তীক্ষ্ণ নজরে রক্তের চাপ দেখতে লাগলো। সর্দারের অমঙ্গল চিন্তা যদিও তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো তবুও নিজকে শক্ত করে নিলো রহমান কিন্তু দৃষ্টি তার রক্তের দিকে। খুব ভালভাবে পাথরের গায়ে লক্ষ্য করতে দেখলো রক্তের কিছু কিছু দাগ বা ছাপ এগিয়ে গেছে অপর দিকে।

ধৈর্য ধরে রহমান রক্তের দাগ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো। অনেকটা এগুনোর পর রক্তে দাগ আরও স্পষ্ট বলে মনে হলো।

রহমান ক্ষুদে ওয়্যারলেস্ বের করে সুইচ টিপলো কিন্তু ওপাশ থেকে একটা উৎকট শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলো না। রহমান আন্দাজ করে

নিলো ঠিক সর্দারের ভীষণ কোনো অমঙ্গল ঘটেছে তবে তার গোপন পকেটে রক্ষিত ক্ষুদে ওয়্যারলেস্টা সজাগ আছে। রহমান সর্দারের আংটিটা বের করে একবার দেখে নিলো। হয়তো বা তিনি ইচ্ছা করেই ওটা ফেলে দিয়ে গেছেন যেন রহমান এই আংটি দ্বারা কিছু উপলব্ধি করতে পারে।

আংটিটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে রহমান, তারপর আংটিটা পকেটে রেখে অগ্রসর হতে থাকে। দৃষ্টি তার পদতলে রক্ত চিহ্নের দিকে। এবার রক্তের চাপ স্পষ্ট মনে হলো। চোখটা তুলে ধরতেই সম্মুখে একটা বড় রকম পাথর খাড়া করা দেখতে পেলো।

একটা আশার আলো পরিলক্ষিত রহমানের চোখেমুখে। রহমান বিরাট আকার পাথরখন্ডটার পাশে এসে দাঁড়ালো পাথরের রক্তচিহ্নটা এসে মিশে গেছে যেন।

রহমান দক্ষিণ হাতে পাথরটাকে খুব জোরে টান মারলো, সঙ্গে সঙ্গে সরে গেলো পাথরটা একপাশে। বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখলো রহমান ভিতরে একটা গুহা এবং গুহার মধ্যে একটা পাথরের মূর্তি।

মূর্তিটার চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

রহমান মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো, বিস্ময়ের উপরে আরও বিস্ময়, মূর্তিটার পায়ের কাছে একটা মস্তকহীন দেহ।

ভীষণ চমকে উঠলো রহমান।

তবে কি সর্দারের এই অবস্থা হয়েছে। না না, এ হতে পারে না। রহমান পাথরটা সরিয়ে ফেলতেই ভিতরে কিছুটা সূর্যের আলো প্রবেশ করেছিলো, সেই আলোতে দেখলো সে ছিন্ন মস্তক একটা দেহ......রক্তে গুহার মেঝেটা রাঙা হয়ে উঠেছে। রহমান আরও লক্ষ্য করলো দেহটা মূর্তির পদতলে উবু অবস্থায় পড়ে আছে।

রহমান চীৎ করে ফেললো রক্তাক্ত দেহটা।

পোশাক পরিচ্ছদ এবং বুকটা লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হলো। এ দেহ তার সর্দারের নয়। এই মস্তকহীন দেহটা কার কে জানে ।

রহমান উঠে দাঁড়ালো।

কিছুক্ষণ পূর্বে যে মস্তকহীন দেহটার পাশে বসে পড়েছিলো। উঠে দাঁড়াতেই দেখলো গুহায় ক্ষুদে দরজা।

রহমান ঐ ক্ষুদে দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো খটখট মৃদু আওয়াজ। রহমান স্থির হয়ে কান পাতলো। ঐ আওয়াজের

সঙ্গে আরও একটা শব্দ কানে আসছে, মনে হলো নিশ্বাসের শব্দ ওটা। কোনো বলিষ্ঠ ব্যক্তির শক্তিশালী নিশ্বাস চলেছে।

রহমান নিজকে সাবধানে গোপন রেখে এগুতে লাগলো। শব্দটা ক্রমে বেশ স্পষ্ট মনে হচ্ছে। কিন্তু কার নিশ্বাসের শব্দ এটা, বড় নির্জন গুহা পথ, তাই শব্দটা অত্যন্ত স্পষ্ট মনে হচ্ছে।

একটু একটু করে এগুচ্ছে রহমান।

অত্যন্ত সাহসী বলেই তার শরীর শিউরে উঠেছে না বা ভীতি ভাব পরিলক্ষিত হয়নি বা হচ্ছে না। পা পা করে এগুচ্ছে রহমান।

আরও কিছুটা এগুতেই একটা গভীর গর্ত নজরে পড়লো। গর্তটা খুব স্পষ্ট নজরে পড়ছে না। ভিতরে বেশ অন্ধকার।

রহমান চোরা পকেট থেকে বের করলো ক্ষুদে টর্চটি। আলো ফেলতেই রহমান অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো—সর্দার...

টর্চের আলো গর্তটার মধ্যে পড়তেই রহমান দেখতে পেলো মস্ত একটা পাথরচাপা অবস্থায় গর্তে শায়িত আছে স্বয়ং বনহুর—তার সর্দার।

রহমান আর্তকণ্ঠে সর্দার শব্দটা উচ্চারণ করতেই বনহুর মাথা তুলেছিলো সামান্য একটু, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায়নি। এতক্ষণ যে শব্দটা রহমানের কানে প্রবেশ করছিলো তা বনহুরের নিশ্বাসের শব্দ এবং যে কট কট শব্দ হচ্ছে সেটা বনহুরের বুকের উপর পাথরখানা ধীরে ধীরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

পাথরখানা কোনো মেশিন দ্বারা চালিত হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রহমান অত্যন্ত সাবধানে গর্তটার মধ্যে নামতে লাগলো। একপাশে নামার জন্য সিঁড়ির মত ধাপ রয়েছে, তাই অতি সহজেই নিচে নেমে এলো রহমান এবং ঝুঁকে পড়ে ডাকলো—সর্দার

বনহুর শুধু উচ্চারণ করলো—অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থায় আছি।

সর্দার! বলুন সর্দার কি করে আপনার এ অবস্থা হলো?

বনহুর বললো—মিস বার্বারা......

ঐ তরুণী তাহলে......

হাঁ, আমাকে সে ভুলপথে নিয়ে এসেছে। রহমান, ঐ যে দেয়ালে একটা সুইচ দেখছো ওটা টিপলে পাথরটা আর চক্রাকারে ঘুরবে না। তারপর যে চাকাটা দেখছো ওটা ঘোরাও......

রহমান দ্রুত উপরে উঠে গেলো এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সুইচ টিপলো।

সঙ্গে সঙ্গে চাকাটা থেমে গেলো এবং বনহুরের বুকে থেমে গেলো পাথরখানা। রহমান এবার চাকাটা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে বিরাট আকার পাথরখানা বনহুরের বুক থেকে উপরে উঠে যেতে লাগলো।

তারপর হঠাৎ শূন্যে ঝুলে পড়লো পাথরখানা। বনহুর জোরে নিঃশ্বাস নিলো প্রাণভরে।

রহমান গর্তে নেমে আসার পূর্বেই উঠে বসলো বনহুর। বেশ কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস নিতে লাগলো দ্রুতগতিতে। তারপর উঠে দাঁড়ালো, রহমান বনহুরের হাত ধরে তুলে নিলো উপরে।

বনহুর আর রহমান ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বেরিয়ে এলো সেই ভয়ঙ্কর গুহা থেকে। বাইরের আলো-বাতাস বনহুর প্রাণভরে গ্রহণ করলো।

রহমান বললো—সর্দার, তাজ কোথায়?

বনহুর ক্লান্তকণ্ঠে বললো— জানি না।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলো বনহুর, রহমানের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো—ঠিক সময়মত এসেছিলে, তাই জঘন্য মৃত্যু থেকে উদ্ধার পেলাম। রহমান?

বলুন সর্দার?

মিস মিনারা মির্জাকে খুঁজে পাবার পূর্বে আমি খুঁজে বের করতে চাই মিস বার্বারাকে।

কোথায় সে? নিশ্চয়ই মিস বার্বারা আপনার সঙ্গে...

হাঁ রহমান। শয়তানী আমার সঙ্গে চালাকি করেছে। মিস মিনারা মির্জাকে খুঁজে বের করবার পূর্বে আমি মিস বার্বারাকে সায়েস্তা করতে চাই। একটু থেমে বললো—এসো রহমান।

রহমান বললো—চলুন সর্দার।

পর্বতটার উপরে ঠিক মাঝামাঝি তারা ছিলো। এবার চারিদিকে লক্ষ্য করে এগুতে লাগলো।

কিছুটা অগ্রসর হতেই দেখতে পেলো ঝরণা পর্বতটার গা বেয়ে নির্মল জলধারা অপূর্ব এক রূপ ধারণ করেছে।

বনহুর আর রহমান এসে দাঁড়ালো সেই নির্মল জলধারার পাশে।

কিছুক্ষণ বনহুর তাকিয়ে রইলো জলধারার দিকে, তারপর বললো— রহমান, আমি বড় পিপাসিত, কাজেই পানি পান করতে চাই তুমিও প্রাণভরে এই পবিত্র নির্মল পানি পান করতে পারো রহমান।

সর্দার, আপনি আগে পানি পান করুন আমি চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছি, কোনো শত্রু পুনরায় হামলা করে না বসে।

বনহুর একটু হেসে বললো—রহমান, তুমি বন্ধুই শুধু নও, আমার জীবন রক্ষক, তুমি আগে পানি পান করো বন্ধু।

সর্দার!

হাঁ রহমান। জীবনে বহু বিপদ আমার এসেছে কিন্তু এমন বিপদের সম্মুখীন আমি কোনোদিন হইনি। বন্দী অবস্থায় যে শাস্তি আমি পেয়েছি তা অত্যন্ত কঠিন যা তোমাকে ভাষায় বর্ণনা করে বোঝাতে পারবো না। তুমি আমাকে সেই ভাষাহীন কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছো।

সবই আল্লাহর ইচ্ছা। সর্দার, আপনি পানি পান করুন।

বনহুর উবু হয়ে ঝরণার পানি দু'হাত ভরে ভরে তুলে নিলো। পান করলো প্রাণভরে। তারপর হাতের পিঠে মুখ মুছে বললো—রহমান, এবার তুমি পানি পান করো, আমি তোমার প্রহরীর কাজ করছি।

রহমান সর্দারের আদেশমত ঝরণায় নেমে গেলো এবং যতটুকু প্রয়োজন পানি পান করলো।

রহমান ঝরণার মধ্যে নেমে গিয়ে পানি পান করলো। কারণ ওর দু'হাত ছিলো না তাই একহাতে আংটি ভরে পানি পান করতে অসুবিধা হচ্ছিলো তার। রহমান উবু হয়ে মুখ দিয়ে পানি পান করে তৃপ্তি বোধ করলো।

পানি পান সমাধা করে ফিরে এলো রহমান সর্দারের পাশে।

বনহুর দাঁড়িয়ে ছিলো ঝরণার পাশে।

এবার বনহুর আর রহমান ঝরণার পাশ দিয়ে এগুতে লাগলো।

কিছুটা এগুনোর পর বললো রহমান—সর্দার, একটা কথা বলবো?

বলো?

মিস বার্বারার বীণাখানা আমি খুলে ফেলেছিলাম।

কি দেখলে?

সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার সর্দার।

বলো?

বীণার মধ্যে রয়েছে একটা ছোট্ট মেশিন।

আমি জানতাম রহমান ও বীণা সাধারণ নয়। বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আমি বীণাখানা তার হাত হতে সরিয়ে নিয়েছিলাম। জানি ঐ বীণার মধ্যে আছে মিস বার্বারার বিশেষ কোনো সম্পদ।

হাঁ সর্দার, আপনার অনুমান সত্য। ঐ বীণার মধ্যে এমন একটা কথা লুকানো আছে যা গভীর রহস্যে ভরা।

বীণাখানা কোথায় রেখেছো?

ঐ স্থানে যেখানে আমি, আপনি আর মিস বার্বারা ছিলাম এবং আপনি আর মিস বার্বারা বিদায় গ্রহণ করেছিলেন।

সেখানেই আছে ওটা?

হাঁ। আমি ওটাকে সাবধানে রেখেছি।

নিশ্চয়ই বার্বারা ওটার সন্ধান করে ফিরছে......একটু থেমে বললো বনহুর—মিস বার্বারা একবার সেখানে যাবেই।

সর্দার, আমরা সেই স্থানে গেলেই তাকে পাবো বলে আশা করছি।

ঠিক, তা আমিও ভাবছি রহমান। চলো।

চলুন তাহলে সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করি।

বনহুর আর রহমান ফিরে গেলো সেই স্থানে। ঐ স্থানের নিকটবর্তী হতেই নজরে পড়লো মিস বার্বারা সেখানে দাঁড়িয়ে চারিদিকে কিছু সন্ধান করছে।

বললো রহমান—সর্দার, আমরা যা ভেবেছি তাই ঠিক। মিস বার্বারা এখানে এসে তার বীণার সন্ধান করছে।

বললো বনহুর—শুধু বীণা নয়, তোমাকেও খুঁজছে সে। মিস বার্বারা জানে আমাকে সে কঠিনভাবে আবদ্ধ করে রেখেছে, কোনোক্রমেই আমি সেই পাথরচাপা থেকে মুক্তি পাবো না, তাই সে এসেছে তোমার সন্ধানে। তোমাকে কাবু করে বীণা উদ্ধার করাই তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু সে উদ্দেশ্য তার কোনোদিন আর সফল হবে না।

সর্দার, দেখুন হতাশভাবে সে সন্ধান করছে চারিদিকে। চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে লক্ষ্য করছে।

হাঁ রহমান, ঠিক বলেছো কিন্তু আর বেশিক্ষণ তাকে...কথা শেষ না করেই বনহুর তার জুতার গোড়ালি থেকে ছোট ক্ষুদে পিস্তলখানা বের করে নিলো, তারপর সোজা গিয়ে হাজির হলো মিস বার্বারার সম্মুখে।

মিস বার্বারা বনহুরকে দেখামাত্র ভূত দেখার মত চমকে উঠলো, চোখের পলক যেন তার পড়তে চায় না। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

বনহুর আচমকা হেসে উঠলো ভীষণভাবে, সে হাসির শব্দে হীরা পর্বতের পাথরগুলো যেন থর থর করে কেঁপে উঠলো।

মিস বার্বারার মুখমন্ডল রক্তশূন্য হয়ে পড়লো। সে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

হাসি থামিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর—মিস বার্বারা, আমাকে দেখে অবাক লাগছে, না? আমি যে অবস্থায় ছিলাম তা থেকে মুক্তি নেই বা ছিলো না। তবু কেমন করে মুক্তি পেলাম, তাই না?

মিস বার্বারা বনহুরের কথাগুলো গিলছে যেন। বারবার ভয়ার্ত চোখে তাকাচ্ছে সে বনহুরের আংগুলের ফাঁকে ক্ষুদে ভয়ংকর অস্ত্রখানার দিকে। জানে সে ঐ অস্ত্রখানা কত সাংঘাতিক।

বনহুর বললো—মিস বার্বারা, তোমার মনের কথা মুখেই প্রকাশ পাচ্ছে। জবাব আর দিতে হবে না ফিরে তাকিয়ে রহমানকে লক্ষ্য করে বলে বনহুর—দুলকী কোথায়?

রহমান এগিয়ে আসে—দুলকী আশেপাশেই আছে, তাকে ডাকবো?

হাঁ!

রহমান মুখের কাছে হাত নিয়ে একটা সংকেতপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করলো, অমনি দুলকী এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

বনহুর দুলকীর পিঠে মিস বার্বারাকে তুলে নিলো। তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো—মিস বার্বারা, তোমার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করবো...

❑

অশ্বপদশব্দে মুখ তুলে তাকালো রহমান।

বনহুর দুলকীর পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো, তারপর বললো—রহমান তুমি যাও সেই গুহায় যে গুহায় আমি আটক ছিলাম।

সর্দার!

হাঁ যাও।

আপনি?

আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

রহমান সর্দারের কথা ঠিক বুঝতে পারলেও সে তার আদেশ পালন করলো।

দুলকী রহমানকে নিয়ে পর্বতের সমতল গা বেয়ে চলে গেলো।

বনহুর একটা পাথরখন্ডে বসে পড়ে ভাবতে লাগলো...হীরা পর্বত সত্যি এক বিস্ময়কর পর্বত—যার গা বেয়ে অশ্ব নিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়েছে। চেষ্টা নিলে আরও উপরে উঠা যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আশ্চর্য বটে পর্বতটা......

ঠিক যায়গায় যেতে বেশি বিলম্ব হলো না রহমানের। সেই পাথরখন্ড তেমনি সরানো রয়েছে, মৃতদেহটা মূর্তিটার পদতলে তেমনি চীৎ হয়ে পড়ে আছে। রহমান দুলকীর পিঠ থেকে নেমে প্রবেশ করলো ভিতরে, তারপর অগ্রসর হতেই কানে এলো নারীকণ্ঠের আর্তস্বর তবে কথা তেমন বোঝা যাচ্ছে না, কেমন যেন অস্পষ্ট গোঙ্গানির মত শোনা যাচ্ছে।

ওদিকে তখন রহমান দুলকী সহ অনেক দূরে চলে গেছে।

রহমান ক্ষুদে টর্চ বের করে গর্তের মধ্যে আলো ফেললো। রহমান স্পষ্ট দেখলো যেমনটা করে তার সর্দার চীৎ হয়ে পড়েছিলো তেমনি চীৎ হয়ে শোয়ানো রয়েছে মিস বার্বারা। তার বুকের উপর সেই পাথরটা চাপানো রয়েছে।

মিস বার্বারার চোখ, মুখ, কান দিয়ে রক্ত ফেনা আকারে বেরিয়ে আসছে। একটা আর্তকণ্ঠস্বর বের হচ্ছে তার মুখ দিয়ে। রহমান বুঝতে পারলো আর বেশিক্ষণ তাকে এ পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে হবে না।

বিরাট আকার ভারী পাথরটা মিস বার্বারার বুক চেপে কেটে বসেছে যেন। আর রক্ষা নেই, বনহুর তাকে বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েছে।

রহমান আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে বেরিয়ে আসে গুহা থেকে। পূর্বের ন্যায় গুহামুখ পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিলো সে। ভিতর থেকে কেউ যেন বেরিয়ে আসতে না পারে সেজন্য ভালভাবে পাথরটা আটকে রাখলো।

অবশ্য এক হাতে কাজ করতে তার খুব কষ্ট হলো, মাথা আর কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছিলো।

রহমান পাথরখন্ডটা ঠিক করে দিয়ে ভালভাবে টেনে দেখে নিলো, তারপর ফিরে চললো যেখানে তার সর্দার অপেক্ষা করেছে। কিন্তু খানিকটা এগুতেই হঠাৎ পড়ে গেলো রহমান আচমকা একটা গর্তের মধ্যে।

পড়ে যাবার পর পরই তার কানে গেলো কঠিন অথচ ক্ষীন আওয়াজ। যে গর্তের মধ্যে রহমান উবু হয়ে পড়ে গেছে সেই গর্তের অভ্যন্তর হতে ভেসে আসছে কথাগুলো। আগাছা আর কিছু জঙ্গল সরিয়ে ফেললো রহমান, অমনি গর্তের মধ্যে একটা ফাটল নজরে পড়লো। রহমান বুঝতে পারলো ঐ ফাটলের ভিতর হতেই শব্দগুলো আসছে। রহমান তাড়াতাড়ি নজর ফেললো ফাটল দিয়ে পর্বতটার ভিতরে।

যা সে দেখলো তা বিস্ময়কর বটে।

একটা গুহা রয়েছে ওপাশে।

গুহার মধ্যে রয়েছে কয়েকজন ব্যক্তি। মশাল জ্বলছে, মশালের আলোতে স্পষ্ট নজরে না পড়লেও রহমান বেশ দেখতে পাচ্ছে একটা তরুণীর হাত দু'খানা শিকল দিয়ে বাঁধা। চুল এবং পরিধেয় বস্ত্র এলোমেলো ছিন্নভিন্ন। শরীরের স্থানে-স্থানে ক্ষতবিক্ষত, রক্ত ঝরছে। তরুণীর সম্মুখের আসনে একজন উপবিষ্ট। তার দু'পাশে দু'জন বলিষ্ঠ লোক দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল। উপবিষ্ট লোকটা কঠিন কণ্ঠে তরুণীকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছে, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না।

রহমান কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে রহমান গর্ত থেকে উঠে এলো।

ফিরে দাঁড়াতেই একটা তীরফলক এসে বিদ্ধ হলো রহমানের পায়ের কাছে।

আশ্চর্য হয়ে তাকালো রহমান সামনের দিকে কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। তীরফলকটা তুলে নিতেই বুঝতে পারলো এই তীর নিক্ষেপকারী অন্য কেউ নয়, সেই ব্যক্তি যে সর্দারকে নরপশু যমদূতের কবল থেকে রক্ষা করেছিলো তাকে হত্যা করে। রহমান তীরফলকটা হাতে নিয়ে ফিরে চললো।

কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে না হতেই সাক্ষাৎ ঘটলো সর্দারের সঙ্গে।

রহমান বললো—সর্দার, আপনি এসে গেছেন।

হাঁ, তোমার বিলম্ব হচ্ছে বলে চলে এলাম।

সর্দার!

তোমার হাতে তীরফলক।

হাঁ সর্দার, এই তীরফলক আর সেদিনের তীরফলকের নিক্ষেপকারী একই ব্যক্তি।

তা আমি তীরফলকটা দেখেই বুঝতে পেরেছি। তাহলে এই নির্জন পর্বতমালার বুকে আমরা একা নই।

না সর্দার, আরও একজন আছে আমাদের সঙ্গে।

না, শুধু একজন নয়— তারপরও আরও একজন আছে আমাদের সঙ্গে, তিনি হলেন আল্লাহ......

সর্দার আর বিলম্ব করবেন না, আসুন আমার সঙ্গে ঐ গর্তটার মধ্যে দেখুন।

গর্তটার মধ্যে?

হাঁ সর্দার।

ওখানে কি?

একটু পরেই সব বুঝতে পারবেন।

চলো।

নামতে হবে ঐ গর্তটার মধ্যে।

ঐ গর্তটার মধ্যে নামতে হবে বলো কি, রহমান?

আসুন সর্দার।

রহমান গর্তটার মধ্যে নেমে পড়লো।

বনহুর নামলো গর্তটার মধ্যে। ততক্ষণে রহমান ফাটলের মুখ থেকে আগাছা সরিয়ে ফেলেছে।

বললো বনহুর—আশ্চর্য!

সর্দার, আরও আশ্চর্য হবেন ঐ ফাটলে চোখ রাখলে।

বনহুর এবার ফাটলে চোখ রাখলো।

একটু পরে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—রহমান, মিস মিনারা মির্জার সন্ধান পেয়ে গেছি!......

কিন্তু......

নিশ্চয়ই পথও আছে! বললো বনহুর।

রহমান আর বনহুর কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলো।

বনহুর বাম পায়ের জুতোর গোড়ালি খুলে একটা ক্ষুদে যন্ত্র বের করলো। যন্ত্রটা ফাটলের মুখে বসিয়ে দিয়ে কান পাতলো সে।

একটু পরেই মুখখানা তার প্রসন্ন হয়ে উঠলো। রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—যে কারণে আমাদের হীরা নগরীতে আগমন সে সন্ধান পেয়ে গেছি রহমান। মিস মিনারা মির্জাকে এরা এখানে পর্বতমালার গোপন গহ্বরে আটক করে রেখেছে এবং তার উপরে চলেছে অকথ্য অত্যাচার......

হাঁ সর্দার, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি এখানেই রয়েছে আমাদের প্রয়োজনীয় জন......সর্দার আর দেরী করা উচিত হবে না। কিন্তু ঐ গুহার মধ্যে প্রবেশের পথ কোথায়......

রহমানের কথায় বললো বনহুর—পথ খুঁজে বের করতে সময় লাগবে না।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে এলো গর্তটার বাইরে।

ঠিক সেই সময় পুনরায় একটা তীরফলক এসে বিদ্ধ হলো বনহুরের পায়ের কাছে যেমনটি বিদ্ধ হয়েছিলো রহমানের পায়ের কাছে।

বনহুর তীরফলকটা হাতে তুলে নিতেই দেখলো তাতে একটা ছোট্ট কাগজ বাঁধা আছে।

রহমান এবং বনহুর অবাক হয়ে দেখতে লাগলো চারপাশে, কাউকে নজরে পড়লো না।

বনহুর কাগজখানা খুলে নিলো হাতে। দৃষ্টি বুলোতেই দেখলো বা বুঝতে পারলো যা তারা খুঁজছে সেই পথের সন্ধান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্পষ্টভাবে। কয়েকটা রেখার মধ্য দিয়ে পর্বতমালার অভ্যন্তরে প্রবেশপথের নির্দেশ।

বনহুর দীপ্তকণ্ঠে বললো—তীর নিক্ষেপকারী যেই হোক না কেন, সে আমাদের পরম বন্ধু।

হাঁ সর্দার, সেই মুহূর্তে তীর নিক্ষেপকারী যদি তীরবিদ্ধ করে ভাস্কর মাইথীকে হত্যা না করতো তাহলে......

মৃত্যু আমার নিশ্চিত ছিলো তাতে কোনো ভুল নেই।

শুধু আপনি নন, মিস বার্বারাও নিহত হতো এবং তার সঙ্গে আমিও...

ভাগ্য বলতে হবে! তীর নিক্ষেপকারী যেই হোক না কেন, তাকে আমি অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই নির্জন পর্বতের মাঝামাঝি সে আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে নিয়ে ভাবার সময় কই। চলো দেখা যাক তীরফলকে গাঁথা কাগজখানার নির্দেশমত ঠিক জায়গায় পৌঁছা যায় কি না।

রহমান বললো—এটা আমাদেরকে নতুন বিপদে ফেলার কোনো ষড়যন্ত্র নয় তো?

মনে হয় না। তবে বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কথাগুলো বলে বনহুর পা বাড়ালো। রহমান তাকে অনুসরণ করলো।

বনহুর মাঝে মাঝে কাগজখানা দেখে নিতে লাগলো। অতি সংক্ষেপে কয়েকটা আঁচড়ের মধ্য দিয়ে পথের সন্ধান।

রহমান বললো—সর্দার, জানি না কি তার উদ্দেশ্য। কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেই অজানা বন্ধু আমাদের আগোচরে আমাদেরকে সহায়তা করে চলেছে।

হাঁ, ব্যাপারটা রহস্যজনক বটে। রহমান?

বলুন সর্দার?

তীরফলকের রহস্যটা কিন্তু এখনও ঠিকমত উদ্‌ঘাটন হয়নি।

সে কথা সত্য সর্দার।

যাক, ওসব নিয়ে ভাবার সময় আমাদের এখন নয়, ওসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি। কই, কোনো চারকোণা পাথর নজরে পড়েছে না তো? কথাগুলো বনহুর বলে পুনরায় কাগজখানার উপর নজর বুলিয়ে চললো।

হঠাৎ রহমান বলে উঠলো—সর্দার, ঐ দেখুন দূরে একটা চারকোণা পাথর পড়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

বনহুর কাগজখানা থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে তাকালো রহমান যেদিক আংগুল দিয়ে দেখাচ্ছিলো সেই দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো—হাঁ, ঠিক পেয়ে গেছি। ঐ সেই চারকোণা পাথর।

বনহুর এক রকম প্রায় দৌড়ে গেলো পাথরটার পাশে। আশ্চর্য রকমের খোদাই করা, কারুকার্য পাথরটার গায়ে। যেন কোনো মন্দির থেকে এই পাথরখানা সরিয়ে আনা হয়েছে।

একটি মূর্তি আঁকা আছে।

বনহুর আর রহমান লক্ষ্য করলো মূর্তিটার চোখ দুটো যেন দুটো সুইচ। বনহুর কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর মূর্তির ডান চক্ষুর মণি আকার সুইচটা টিপলো।

সঙ্গে সঙ্গে চারকোণা পাথরটা সরে গেলো একপাশে—একটা একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—আর এক দন্ড বিলম্ব করো না, চলো নিচে নেমে যাই। কিন্তু সাবধান, মৃত্যু আমাদের জন্য ওৎ পেতে আছে।

জানি সর্দার এবং সেজন্য প্রস্তুত আছি।

রহমান, তোমার একটা হাত বিনষ্ট হয়েছে তাই...

সর্দার, আপনি সেজন্য মোটেও ভাববেন না।

এসো নেমে পড়ি।

চলুন সর্দার।

বনহুর প্রথমে তারপর রহমান সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে চললো।

আধো অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো বনহুর আর রহমান। পর্বতমালার অভ্যন্তরে যে এমন একটা রহস্যপূর্ণ সুড়ঙ্গপথ আছে তা কেউ কোনোদিন ভাবতেও পারবে না।

পর্বতের কঠিন পাথর কেটে এ সুড়ঙ্গপথ তৈরি করা হয়েছে।

সুড়ঙ্গপথটা কিছুটা অগ্রসর হয়ে বাঁকা হয়ে এগিয়ে গেছে। ঠিক সুড়ঙ্গপথটার বাঁকে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর, রহমান তার পেছনে। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ভিতরে কথাবার্তা যা হচ্ছে।

সেই কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা গেলো যা তারা পর্বতমালার উপরিভাগ হতে অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিলো। বনহুর আরও একটু এগুলো।

এবার সে মশালের আলোতে দেখতে পেলো সেই তরুণীটিকে যার হাত দু'খানা লৌহশিকল দ্বারা আটকানো তাকে কতকটা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

বড় করুণ নির্মম অবস্থা।

দেহের বসন ছিন্নভিন্ন।

চুল এলোমেলো।

দেহের কোনো কোনো স্থানে জামাকাপড় ছিঁড়ে শরীরের কিছু কিছু অংশ নজরে পড়ছে।

স্থানে স্থানে কেটে রক্ত ঝরছে।

হয়তো বা একটু পূর্বেও তাকে চাবুক দ্বারা নির্যাতিত করা হয়েছে।

তার চোখেমুখে বেদনার চিহ্ন।

মুখমন্ডলে যন্ত্রণার ছাপ বিদ্যমান।

বনহুর মুহূর্তে সবকিছু দেখে নিলো। রহমানকে লক্ষ্য করে চাপাকণ্ঠে বললো—মিস মিনারা মির্জাকে শাস্তি দিয়েই ওরা ক্ষান্ত হয়নি, তার নিকট হতে কিছু কথা ওরা বের করে নিচ্ছে...

হাঁ সর্দার, তাই মনে হচ্ছে।

বনহুর বললো—প্রেসিডেন্ট কন্যা নরপশুদের দাবি মেনে নেয়নি এবং সে কারণেই তারা মিস মিনারার উপর নির্যাতন চালিয়ে চলেছে।

সর্দার, মিস মিনারা মির্জার ঘাড়খানা ঝুলে পড়েছে, আর কিছুক্ষণ সে এইভাবে থাকলে ওর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

হাঁ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তার পূর্বেই তাকে উদ্ধার করতে হবে এবং এই মুহূর্তেই...কথা শেষ করেই বনহুর রহমানকে কিছু ইঙ্গিত করলো।

ঐ সময় আসনে বসা ব্যক্তিটি উঠে দাঁড়ালো, হয়তো বা ফিরে যাবে সে নিজের বিশ্রামকক্ষে অথবা কোনো কাজে।

বনহুর আরও লক্ষ্য করলো তার দু'পাশে যারা মশাল হাতে দণ্ডায়মান ছিলো তারা মশালগুলো গুঁজে রাখলো গুহার দেয়ালে।

ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত।

এমন সময় একজন লোক প্রবেশ করলো সেখানে, বললো—

রঘুনাথজী, প্রেসিডেন্ট মির্জা আমাদের দাবি পূরণ করার জন্য সম্মত হয়েছে। তারা আমাদের টাকা ঠিকমত পৌঁছে দেবে......

রঘুনাথ অট্টহাসি হেসে বললো আমার দাবি পূরণ না করে পারবে না কোনো বেটা। তবে কি জানিস, দাবি পূরণ করলেও মিস মির্জাকে আর ফেরত পাবে না প্রেসিডেন্ট মির্জা, বুঝলি?

তা আমরা জানি মালিক। টাকা যখন আসবে তখন আমরা প্রেসিডেন্ট মির্জাকেও আটক করে ফেলবো। সে ফাঁদ আমরা তৈরি করে রেখেছি। কথাগুলো বললো নতুন আগত লোকটা।

রঘুনাথ পূর্বের ন্যায় অট্টহাসি হেসে বললো—আমার নাম রঘুনাথ, আমি যাকে হাতের মুঠায় একবার ভরি তাকে আর মুক্ত করে দেই না। মিস মিনারা মির্জাকে আমি আমার বিশ্রামাগারে নাচনেওয়ালী বানাবো আর ওর বাবা প্রেসিডেন্ট মির্জাকে বানাবো ঝুলন্ত কংকাল। কোনোদিন তারা আর হীরা নগরীতে ফিরে যেতে পারবে না। হাঃ হাঃ হাঃ, শোনো নিমচাঁদ, প্রেসিডেন্ট নিজে আসবে তো?

হাঁ, সে নিজে আসবে, নাহলে তো সে মেয়েকে ফিরে পাবে না বলেই আমরা চিঠিতে জানিয়েছি। কথাগুলো বললো নিমচাঁদ।

বনহুর আর মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে ভীষণভাবে আক্রমণ করলো রঘুনাথ ও তার সঙ্গীদের।

রহমানও চুপ রইলো না।

রঘুনাথ ও তার সঙ্গীরা মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। তারা ভাবতেও পারেনি এমন ঘটনা ঘটবে।

রঘুনাথ অস্ত্রহাতে তুলে নেবার পূর্বেই তাকে বনহুর ধরাশায়ী করলো। বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরলো তার গলা!

ততক্ষণে অন্যান্য নরপশু আক্রমণ করেছে রহমানকে।

রহমানের হাতের মুঠায় ছিলো ক্ষুদে পিস্তলখানা, যার শক্তি ছিলো ভয়ঙ্কর একসঙ্গে বারোটা গুলী এই ক্ষুদে পিস্তলে ভরা ছিলো।

রহমান নিমিষে রঘুনাথের মশালধারী ও একজন অস্ত্রধারী মোট তিনজন সঙ্গীকে খতম করে ফেললো। বেশি বেগ পেতে হলো না এ ব্যাপারে তাকে। কারণ এরা মোটেই প্রস্তুত ছিলো না এই আক্রমণের জন্য।

রহমান ওদের তিন জনকে খতম করে ফিরে তাকালো।

সর্দার আর ভীমদেহী: রঘুনাথ মিলে চলেছে ভীষণ যুদ্ধ।

রহমান তার ক্ষুদে পিস্তল ব্যবহার করতে পারছে না হঠাৎ যদি সর্দার নিহত হন। কাজেই সংযত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মিস মিনারা মির্জার এতক্ষণে যেন একটু হুশ হয়েছে। সে তাকিয়ে দেখছে। ব্যাপারখানা যেন তার কাছে বিস্ময়কর লাগছে। মিস মিনারা মির্জা জানে, তাকে এমন এক জায়গায় এনে বন্দী করে রাখা হয়েছে যেখানে কেউ কোনোদিন তার সন্ধান পাবে না। ভাবছে মিনারা কারা এ দু'জন? তার শত্রু না মিত্র? নরপশুদের হত্যা করে তাকে মুক্ত করতে চায় না তাকে আরও শাস্তি দিতে চায়? মিস্ মিনারা মির্জা মনপ্রাণে খোদার নাম স্মরণ করে চলে।

রহমান তার দক্ষিণ হাতে মারাত্মক পিস্তলখানা উঁচু করে ধরে অপেক্ষা করছিলো সুযোগ পেলেই রঘুনাথের দেহ ঝাঝ্‌রা করে দেবে।

বনহুর এক সময় রঘুনাথকে মাটিতে ফেলে তার বুকে চেপে বসলো, দু'হাতে টিপে ধরলো ওর গলা।

বনহুরের বজ্রমুষ্টির চাপে রঘুনাথের নাকমুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। জিভটা বেরিয়ে পড়লো খানিকটা। বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবার রঘুনাথের বুক থেকে!

রহমান পিস্তল লক্ষ্য করলো রঘুনাথের মাথা লক্ষ্য করে।

কিন্তু বনহুর তাকে বাধা দিয়ে বললো—না, ওকে এভাবে হত্যা নয়। মিস মিনারা মির্জার স্থানে ওকে ঝুলিয়ে দাও, তারপর......

রহমান ঠিক সেইভাবে কাজ করলো।

সে বনহুরের সাহয্যে মিস মিনারা মির্জার হাত দু'খানা মুক্ত করে ফেললো এবং বনহুর নিজে মিস মিনারা মির্জাকে কাঁধে করে নামিয়ে আনলো উঁচু মঞ্চ বা বেদী থেকে। তাকে বসিয়ে দিলো মেঝেতে।

তারপর রঘুনাথের বিশাল বিরাট দেহটা মিস মিনারা মির্জার স্থানে ঝুলিয়ে দিলো।

বনহুর বললো—ওর চোখ দুটো তুলে ফেলো রহমান।

রহমান সর্দারের আদেশ পালন করতে মোটেই বিলম্ব করলো না।

❑

জাভেদ তুমি ঠিক চিনতে পেরেছিলে তিনি তোমার বাবা বনহুর? কথাগুলো শান্ত মিষ্ট গলায় বললো আশা।

জাভেদ একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ফল খাচ্ছিলো। পিঠে তার তীরধনু বাঁধা। বললো—বাপুকে আমি চিনতে পারবো না, এ কথা তুমি ভাবতে পারলে আশা আম্মু।

জাভেদ আমি জানি তুমি তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছো। তবু মন বলে হয়তোবা ভুল হয়েছে তোমারই! কথাগুলো বড় আনমনাভাবে বললো আশা।

আশার মুখে দৃষ্টি রেখে বললো জাভেদ—বাপু না এলে হয়তো তোমার সাহায্য নিয়ে আমাকেই এ কাজ সমাধা করতে হতো। মিস মিনারা মির্জার অবস্থা বড় শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো।

আশা বললো—জানতাম সে আসবে!

তুমি জানতে?

হাঁ।

কিন্তু কেমন করে তুমি জানতে বাপু এই হীরা পর্বতে আসবে?

আমার মন বলতো।

তোমার মন?

হাঁ জাভেদ। একটু থেমে বললো আশা—তোমার বাপু শুধু দস্যুই নয়, সে একজন মহাপুরুষ। পৃথিবীর এমন কোনো সংবাদ নেই যা সে জানে না। জাভেদ, তোমার বাপুর সঙ্গে তুলনা হয় না কারও।

আশা যখন গদগদ কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলো তখন বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলো জাভেদ তার মুখের দিকে। সে যেন আশার অন্তরটা দেখতে পাচ্ছিলো। বললো জাভেদ—আশা আম্মু, তুমি বাপুকে চেনো? তার সম্বন্ধে সব জানো?

জাভেদ, তুমি আমার সন্তান সমতুল্য। একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না। জীবনে আমি কোনো পুরুষকে আমার যোগ্য ব্যক্তি মনে করতে পারিনি। কারণ আমি আমাকেই সাবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছি। মনে করতাম পুরুষগুলো বড় স্বার্থপর নারীদের রূপ-যৌবন ভোগ করার জন্য তারা সদা ক্ষুধিত শার্দুলের অথবা তৃষ্ণার্ত চাতকের মত নারীদের পেছনে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ায় কিংবা সুযোগ পেলে বাজপাখীর মত থাবা বসিয়ে দেয়। তাই বড় ঘৃণা আসতো পুরুষদের উপর এবং সে কারণেই আমি নিজকে কোনোদিন কোনো পুরুষের কাছে ধরা দেইনি।

আশা আম্মু, আমি জানি তুমি বিয়ে করোনি কোনোদিন।

হাঁ, সে কথা সত্য এবং বিয়ে না করার পেছনে রয়েছে পুরুষদের প্রতি ঘৃণা, এই একটি কারণেই আমি...কথা শেষ না করেই থেমে যায় আশা, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—শুধু একটিমাত্র পুরুষকেই দেখলাম যার মধ্যে নেই কোনো লোভ লালসা মোহ আর সেই কারণেই আমি তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসলাম......

সত্যি, সত্যিই তুমি ভালোবাসো আমার বাপুকে?

হাঁ—হাঁ জাভেদ।

কিন্তু বাপুতো......

না, সে কোনোদিন আমাকে ভালবাসতে পারেনি......

বড় নিষ্ঠুর আমার বাপু। আশা আম্মু, আমি শপথ করে বলছি, বাপুকে তোমার কাছে ধরে আনবোই আনবো। কেন সে তোমার ভালবাসার মূল্য দেয়নি! বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে জাভেদের কণ্ঠস্বর।

আশা দু'হাতে চেপে ধরে জাভেদের জামার আস্তিন—না না, তা হয় না জাভেদ। আমি তাকে ভালবাসি কিন্তু তার প্রতিদান আমি চাই না।

আশা আম্মু, আমি জানি বহুবার তুমি আমার বাপুকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছো...

সে আমার ধর্ম, আমার কর্তব্য।

তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না আশা আম্মু। বাপুকে আমি ধরে আনবোই তোমার পাশে! কথা শেষ করেই জাভেদ ছুটে যায় তার অশ্বের পাশে।

আশা ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকে—জাভেদ, শোন্ ওরে তুই যাস্‌নে শোন্...ছুটে যায় আশা।

কিন্তু ততক্ষণে চলে গেছে জাভেদ।

শুধু শোনা যায় অশ্বপদশব্দ।

আশার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। বনহুর তার ধ্যান স্বপ্ন, জানে আশা ওকে কোনোদিন সে পাবে না তবু কেন সে তাকে ভালবাসে। কেন সে ভুলতে পারে না, কেন সে মুছে ফেলতে পারে না তার স্মৃতি বুক থেকে? আশা দু'হাতে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলো। কেন সে আজ জাভেদের কাছে অন্তরের কথা খুলে বলতে গেল? কেন সে এমন মারাত্মক ভুল করলো? জাভেদ ঠিক তার বাপুর মতই দুঃসাহসী, ভয়ংকর। যা সে বলে তা সে করেই...পুত্র হয়ে পিতাকে ধরে আনবে পিতার প্রেম ভিখারী নারীর কাছে! ছিঃ ছিঃ আশা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে। সত্যি যদি বনহুরকে ধরে নিয়ে আসে কি বলবে? কি জবাব দেবে সে তখন?

আশা তো বনহুরের মোহত্যাগ করেছে তবে কেন সে আবার বলতে গেলো সন্তানসম জাভেদের কাছে মনের গোপন কথা?

নূরী সব জেনে নিজে সন্তানকে দান করেছে তার হাতে। স্বামীর জীবন রক্ষাকারিণী আশাকে নূরী খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। তবু কেন আশা আজ এ কথা প্রকাশ করতে গেলো জাভেদের কাছে!

আশা পায়চারী করতে লাগলো তার গৃহের উঠানে।

আশার ভারী বুটের শব্দের প্রতিধ্বনি হচ্ছিলো। ভারী বুট দুটো যেন আশাকে বিদ্রুপ করছে। দু আংগুলে কান বন্ধ করে ফেলে আশা।

জাভেদের অশ্বের খুরের আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না।

আশা নিজ অশ্বের পাশে এসে দাঁড়ালো, তবে কি সে জাভেদকে ফিরিয়ে আনবে কিন্তু কে জানে জাভেদ কোন পথে কতদূর চলে গেছে!

❑

হীরা পর্বতের কাছাকাছি মোটরখানা এসে থামলো।

প্রেসিডেন্ট মিঃ মির্জা নিজে ড্রাইভ করে এনেছেন গাড়িখানা। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই। অবশ্য কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই মির্জা সাহেব কোনোরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অর্থের বিনিময়ে যদি একমাত্র কন্যাকে ফিরে পান সেটাই হবে তাঁর পরম ভাগ্য। আশায়, উন্মাদনায় মিঃ মির্জার বুক ধক্ ধক্ করছে। সত্যি কি তিনি কন্যা মিনারাকে ফিরে পাবেন। স্ত্রীর অশ্রুসিক্ত মুখখানা বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছেন মিসেস মির্জা। মিনারা যে তাঁদের নয়নের মণি—তাকে আজ কতদিন দেখেননি, কি অভিশাপ নেমে এসেছে তাঁদের জীবনে।

গাড়ির পেছন দিকে রয়েছে মিনারার মুক্তির দাবি পূরণের টাকা। মিঃ মির্জা গাড়ি রেখে নেমে দাঁড়ালেন। দৃষ্টি তার চারিদিকে সন্ধান করে ফিরছে। কোথায় ওরা? তবে কি এটা চালাকি? তাঁকে ধোঁকা দিয়ে এখানে আনা হয়েছে। পুলিশ কর্মকর্তাগণ তাঁকে সাহায্য ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা জীবন দিয়ে সহায়তা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু জনাব মির্জা সাহসী হননি। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করতে গেলে কন্যাকে তিনি ফিরে পাবেন না। তাই ভীত প্রেসিডেন্ট সবার অজ্ঞাতে এসেছেন হীরা পর্বতের পাদমূলে।

ব্যাকুল চোখে তাকাচ্ছিলেন মিঃ মির্জা।

নিজের বুকের স্পন্দন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন।

কিন্তু কোথায় তার জীবন-ধন কন্যা মিস মিনারা মির্জা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি। চোখের পাশে হাত রেখে তিনি দেখছেন, কারণ সূর্যের তাপ এখন প্রখর। শরীর ঘামে ভিজে চুপসে গেছে। ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে মির্জা সাহেবের চোখেমুখে।

হঠাৎ এমন সময় মির্জা সাহেব দেখতে পান দূরে পর্বতমালার গা বেয়ে নিচে নেমে আসছে তিনজন লোক। মির্জা সাহেবের চোখমুখ আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠলো। ভালভাবে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলেন তার কন্যার হাত ধরে দু'ব্যক্তি তাকে নিচে নামিয়ে আনছে। ঠিক, নরপশুর দল তাঁকে তাঁর কন্যা ফেরত দিয়ে অর্থ গ্রহণ করতে আসছে।

যাক সব অর্থ তাঁর চলে যাক তবু কন্যাকে ফিরে পাবেন এটাই তাঁর বড় আনন্দ! তাঁদের জীবনের পরম সম্পদ মিনারা।

ক্রমে লোকগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট মিঃ মির্জা। লোক দু'জন তাঁর কন্যা মিনারাকে বেশ যত্ন সহকারে ধরে ধরে আসছে। কিন্তু একি, ওরা মিনারার একি অবস্থা করেছে। পাষন্ড নির্দয় নরপশুর দল......ভালভাবে লক্ষ্য করতেই মির্জা সাহেবের বুক ফেটে কান্না আসছিলো।

একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা তিনজন।

বিস্মিত হচ্ছেন মিঃ মির্জা লোক দু'জন তাঁর কন্যাকে এত যত্ন সহকারে আনছে, দেখে মনে হয় না তারা কোনো শত্রুপক্ষের লোক।

ওরা নিকটবর্তী হতেই প্রেসিডেন্ট মিঃ মির্জা এক রকম প্রায় ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে কন্যাকে—মা, মাগো। মা তোমার এ অবস্থা কেন?

মিস মিনারা মির্জাও পিতাকে জড়িয়ে ধরে আকুলভাবে কাঁদতে শুরু করলো।

প্রথম বিহ্বলতা কেটে গেলে বললেন মিঃ মির্জা—নাও তোমাদের টাকার স্তূপ। আমার জীবন-ধনকে ফিরিয়ে দাও। যাও ঐ গাড়ির মধ্যে তোমাদের দাবি পূরণের সব টাকা আছে। যাও নাওগে, আমার মা মনিকে তোমরা আর কেড়ে নিও না।

বনহুর বুঝতে পারলো প্রেসিডেন্ট মির্জা কন্যাশোকে পাগলপ্রায়। তিনি তাদেরকেও মনে করেছে তার কন্যার হরণকারী। কিন্তু এটা স্বাভাবিক, কি করে তিনি বুঝবেন এরা তারা নয়।

পিতা-কন্যা কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলে বললো বনহুর—মিঃ মির্জা, আমরা আপনার কন্যার হরণকারী নই এবং আমাদের অর্থের কোনো দাবিও নেই।

বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন মিঃ মির্জা বনহুর আর রহমানের মুখের দিকে। তাদের কথা বিশ্বাস হচ্ছিলো না।

মিস মির্জা বললো—আব্বু, যারা আমাকে আটক করেছিলো এরা তারা নয়...

সত্যি বলছো মা মণি?

হাঁ আব্বু।

তাহলে এরা কারা?

জানি না তবে যতটুকু জেনেছি তাতে বুঝতে পেরেছি এরা অতি মহৎ ব্যক্তি আব্বু, এরা আমাকে উদ্ধার না করলে মৃত্যু আমার নিশ্চিত ছিলো।

মা, মা মণি...

হাঁ আব্বু, এরা যদি আমাকে সেই মৃত্যু গহ্বর থেকে উদ্ধার করে না আনতো তাহলে কোনোদিনই আমি ফিরে আসতাম না। তোমরা কোনোদিন আমার খোঁজ পেতে না। হীরা পর্বতের অভ্যন্তরে আমার দেহ পঁচে-খসে-গলে একদিন কংকালে পরিণত হতো।

না না, আমি আর শুনতে চাইনা মা। আমি আর শুনতে চাই না। তোকে ফিরে পেয়েছি এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। বনহুর আর রহমানের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথাকরুণ কণ্ঠে বললো—তোমরা যেই হও না কেন, ঐ গাড়ির মধ্যে যে টাকা আমি এনেছি সব নিয়ে যাও। সব নিয়ে যাও তোমরা।

বনহুর এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো মিঃ মির্জার পাশে, বললো—আপনি কন্যাকে নিয়ে ফিরে যান। আপনার টাকা কেউ নেবে না।

তোমরা নেবে না? এত টাকা তোমরা নেবে না?

না।

আমার মেয়েকে তোমরা বাঁচিয়েছো সব তোমাদের দিচ্ছি। তোমরা যেই হও গ্রহণ করো, কারণ আমার মা মিনারার জীবনের বিনিময়ে ওগুলো তোমাদের......

থাক প্রয়োজন হবে না। নিন উঠে পড়ুন গাড়িতে। এত টাকা নিয়ে পথে কোনো বিপদ আসতে পারে।

প্রেসিডেন্ট মির্জা বললেন—হাঁ বাবা, তোমরা ঠিকই বলছো, পথে আবার কোনো বিপদ আসতে পারে। তা ছাড়া আনন্দে আমার হাত পা অবশ হয়ে গেছে আমি গাড়ি চালিয়ে ফিরতে পারবো না। জানো তো পুলিশ বা আমার কোনো কর্মচারীর সাহায্য আমি নেইনি। কারণ তারা আমাকে

জানিয়ে দিয়েছিলো যেন পুলিশের সাহায্য গ্রহণ না করি। করলে আমার মেয়েকে ফিরে পাবো না।

সে বিপদ কেটে গেছে প্রেসিডেন্ট সাহেব, আপনি এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। উঠে পড়ুন...

প্রেসিডেন্টের চোখ দুটো কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। তিনি আর বিলম্ব না করে গাড়িতে উঠে বস্‌লেন, পাশে ছিলেন মিস মিনারা।

বনহুর ড্রাইভিং আসনে উঠে বসে বললো...রহমান, তুমি এখানে অপেক্ষা করো অথবা দুলকীকে নিয়ে ফিরে যাও।

আপনি?

আমি তাজকে খুঁজে বের করবো তারপর ফিরবো।

আচ্ছা!

রহমান দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর কন্যা মিনারা সহ গাড়ি ছাড়লো।

রহমান স্থিরচোখে তাকিয়ে রইলো গাড়িখানার দিকে।

গাড়িখানা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে ফিরে দাঁড়ালো রহমান। মুখের কাছে হাত নিয়ে শব্দ করলো, একবার দুই বার তিন বার, কেটে গেলো কিছুক্ষণ।

এক সময় দুলকী এসে দাঁড়ালো রহমানের পাশে।

রহমান আর বিলম্ব না করে দুলকীর পিঠে চেপে বসলো।

❑

নূর পোশাক পরিচ্ছদ পরে তৈরি হয়ে নিচ্ছিলো। তাড়াতাড়ি তাকে বেরুতে হবে। কারণ পুলিশ অফিস থেকে জানানো হয়েছে স্বয়ং দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে।

কথাটা শোনার পর ভীষণ আনন্দ বোধ করছে। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য তার সাধনার শেষ নেই। তার ধ্যান জ্ঞান স্বপ্ন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া।

নূর অনেকের মুখেই শুনেছে দস্যু বনহুর অসহায় দুঃস্থ মানুষের পরম বন্ধু। তবু সে তাকে সমর্থন করে না, দস্যু সে দস্যুই। তার মহত্বের কোনো

দাম নেই। কেউ দস্যু বনহুর সম্বন্ধে বললে নূর যেন তা সহ্য করতে পারে না। অসহ্য লাগে তার কাছে ঐ নামটা।

আজ সেই দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে শুনে আনন্দে আত্মহারা প্রখ্যাত তরুণ গোয়েন্দা নুরুজ্জামান চৌধুরী। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলো আর ভাবছিলো দস্যু বনহুরকে আজ সে স্বচক্ষে দর্শন করবে, তাকে উপযুক্ত সাজা দেবার ব্যবস্থা করবে।

আয়নায় দৃষ্টি রেখে ভাবছিলো সেদিনের কথা। একা একা বসেছিলো নূর ঠিক ঐ মুহূর্তে জমকালো পোশাক পরা ভীষণ চেহারার এক ছায়ামূর্তির আর্বিভাব ঘটেছিলো সেই কক্ষে। ছায়ামূর্তি অন্য কেউ নয়—স্বয়ং দস্যু বনহুর।

নূরের মাথা থেকে পা অবধি রাগে-ক্ষোভে গরম হয়ে উঠেছিলো কিন্তু তাকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ হয়নি। সেই রাগ আজও আছে এবং চিরকাল থাকবে...

হঠাৎ চিন্তাধারায় বাধা পড়ে নূরের, আয়নায় মায়ের ছবি দেখতে পায়। ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠে—আম্মু, তুমি অসময়ে?

মনিরা বলে—কেন, সন্তানের কাছে মায়ের আবার সময়-অসময় আছে নাকি?

না, ঠিক তা বলছি না, তুমি কোনোদিন এমন সময় আসোনা কিনা তাই! দাদীমা ভাল আছেন তো?

হাঁ, ভালই আছেন।

আম্মু কেন এসেছো বলবে তো?

এত তাড়াহুড়া করে কোথায় যাচ্ছিস নূর? নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলে মনিরা—এখন তো তোর অফিসে যাবার কথা নয়!

আম্মু, একটা কথা এখনও তোমাকে জানানো হয়নি। জানো আম্মু, যাকে গ্রেপ্তার করবো বলে আমি সাধনা করে চলেছি, সেই ভয়ংকর দস্যু গ্রেপ্তার হয়েছে!

মনিরার মুখমন্ডল যেমন ছিলো তেমনি রইলো, কোনো পরিবর্তন হলো না। তার মুখখানা গম্ভীর শান্ত বলে মনে হলো নূরের কাছে।

নূর বললো—আম্মু, তুমি খুশি হওনি?

সে তো আমার কোনো ক্ষতিসাধন করেনি।

তোমার না করতে পারে কিন্তু দেশবাসীর সে চরম ক্ষতি সাধন করে চলেছে। দেশের দশের মঙ্গল যে আমার তোমার মঙ্গল.....

জানি তবু.....

তবু তুমি খুশি নও!

নূর, একটা কথা তোকে বলবো......

আজ নয় আম্মু, শুনবো আর একদিন। প্লিজ আম্মু, তুমি থাকো আমি ফিরে এসে একসঙ্গে খাবো! কথাটা শেষ করেই বেরিয়ে যায় নূর।

মনিরা নির্বাক পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, পিছু ডাকবার মত আর মনোবল থাকে না। দু'গন্ড বেয়ে দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ে তার। সন্তানের কাছে এই লুকোচুরি আর যেন ভাল লাগে না। কতদিন আর গোপন রাখা যায়......না, আর পারবে না সে গোপন রাখতে। এখন নূর বড় হয়েছে, সে বুঝতে শিখেছে। সব কথা খুলে বলাই ভালো কিন্তু কি করে বলবে সবকিছু। সত্যি কি বনহুর বন্দী হয়েছে? মন বলছে সে বন্দী হয়নি তবু যদি তার মনের কথা সত্য না হয়...

অধীরভাবে মনিরা সঠিক সংবাদের প্রতীক্ষা করতে থাকে!

একি, এ যে একেবারে অধৈর্য, সময় যেন কাটতে চায় না।

মনিরা পায়চারী করে চলে। তবে কি সত্যি সে বন্দী হয়েছে? ওকে কতদিন দেখেনি, কতদিন ওর সান্নিধ্য লাভ করিনি। কোন নারী না চায় তার স্বামীকে পাশে পেতে কিন্তু সে সাধ তার পূর্ণ হবার নয়...

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠে।

মনিরা রিসিভার হাতে তুলে নেয়, ওপাশ থেকে ভেসে আসে নূরের গলা....আম্মু, সবি মিথ্যা, দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়নি। ভুল করে পুলিশবাহিনী অন্য একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বসেছে। লোকটা অন্য লোক, একটা হাত তার পঙ্গু।

মনিরা শুধু রিসিভারখানা হাতে ধরেছিলো, কোনো জবাব দিচ্ছিলো না। বনহুর মানে তার স্বামী গ্রেপ্তার হয়নি তাহলে। একখানা হাত নেই এমন এক পঙ্গুকে পুলিশবাহিনী গ্রেপ্তার করেছে। সে-ব্যক্তি কে?

ওপাশ থেকে ভেসে উঠে নূরের কণ্ঠস্বর...অশ্বপৃষ্ঠে সে কান্দাই শহরের বনাঞ্চলের কোনো এক গোপনপথ দিয়ে শহরে প্রবেশ পথে পুলিশের কবলে ধরা পড়ে গেছে। আম্মু, তুমি কথা বলছো না কেন?

মনিরা বললো—সব শুনে যাচ্ছি, এতে আমার জবাব দেওয়ার না দেওয়ার কি আছে। তুমি চলে এসো, আমি এক্ষুণি ফিরে যাবো।

আম্মু, অল্পক্ষণ অপেক্ষা করো, একসঙ্গে খাবো। কতদিন একসঙ্গে খাইনা। যেও না যেন, আমি এলাম বলে।

মনিরা পুত্রের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, ও এলে একসঙ্গে খাবে মা ও ছেলে। মনিরার নয়নমনি নূর, সত্যি তার সন্তান ছাড়া আর কেই বা আছে। জীবন-মন দিয়ে ভালবেসেছিলো স্বামীকে কিন্তু সে তাকে পায়নি, যতটুকু পেয়েছে সে পাওয়ায় মন ভরে না। আরও নিবিড় করে পাবার জন্য মন চেয়েছিলো কিন্তু বড় হতভাগী সে, স্বামীকে তেমনভাবে পায়নি। তার উপহারই তো নূর......না না, নূরকে সে মা হয়ে অবহেলা করবে না।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করে এলবামখানা।

প্রথম পাতা খুলতেই নূর আর মনিরার ছবি। নূরকে কোলে করে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছে মনিরা নরম তুলতুলে গাল দুটো। কতক্ষণ নির্বাক হয়ে দেখলো তারপর পাতা উল্টে চললো। শুধু মনিরা আর নূর। এই এলবাম নিয়ে কতদিন নূর প্রশ্ন করেছে, আম্মু বলোনা আমার আব্বু কোথায়? বলোনা আমার আব্বু কোথায়? মনিরা কোনো জবাব দিতে পারেনি। হয়তো বা রাগ করেছে সে, মাঝে মাঝে বলেছে, এই তো আমি আছি। আব্বুর কি দরকার? নূর বুঝতে চায়নি, বলেছে—সবার আব্বু আছে আর আমার আব্বু থাকেনা কেন? এমনি কত প্রশ্নের পর প্রশ্ন...

আম্মু, কি দেখছো?

ছোটবেলায় কত দুষ্টু ছিলে তাই দেখছি।

আম্মু, এখনও আমি কিন্তু বড় দুষ্ট আছি। তোমাকে বড্ড জ্বালিয়ে মারি, তাই না?

নে বাবা, অনেক হয়েছে। যাও হাত-মুখ ধুয়ে খেতে এসো, আমি টেবিলে খাবার দিতে বলি।

আচ্ছা আম্মু, তাই বলো।

মনিরা বেরিয়ে যায়।

নূর টাই খুলতে থাকে।

হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে এসে বসে নূর।

মনিরাও সম্মুখে থালা দিয়ে খাবার পরিবেশন করে চলে, তারপর নিজেও খাবার তুলে নেয়।

নূর খেতে খেতে বলে—আম্মু, ভেবেছিলাম দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে বেশ ভালই হলো। আমি নিশ্চিন্ত—কিন্তু পৌঁছে শুনি সব ব্যর্থ, যাকে পুলিশবাহিনী গ্রেপ্তার করেছে সে দস্যু বনহুর না অন্য লোক।

টেলিফোনে আমি শুনেছি!

সত্যি আম্মু, সব আশা আমার নষ্ট হয়ে গেলো। যাকে ওরা দস্যু বনহুর হিসেবে পাকড়াও করেছে সে একজন পঙ্গু....

তাও শুনলাম। যাক্ ওসব কথা, এবার খেয়ে নাও বাবা।

তুমি কিন্তু কিছু খাচ্ছো না আম্মু!

এইতো খাচ্ছি।

আম্মু?

বল্?

তুমি এ বাড়িতে থেকে যাও আম্মু।

তা হয় না, তোর দাদীমা তাকে ছেড়ে।

যদি তিনি আসতে চান তাকেও নিয়ে আসবো। কিন্তু আসবেন না তিনি। ও বাড়ি যে তাঁর স্বামীর বাড়ি। বড় সাধনার ধন।

আম্মু, তোমরা মেয়েরা বড় একরোখা। স্বামীর সংসারকে তোমরা আঁকড়ে ধরে রাখতে চাও সর্বক্ষণের জন্য।

ওসব তুই বুঝবি না।

একসময় খাওয়াপর্ব শেষ হয়ে যায়।

বলে মনিরা—এবার রেখে আসবি না নূর?

নিশ্চয়ই। তবে এখন নয়, আরও কিছু পরে।

নূর, এমন জেদ করলে আর আসবো না। এখনও তোর ছেলে মানুষি গেলো না।

আম্মু...তুমি আজ একটা সত্যকথা বলবে?

বল্ কি কথা?

তুমি কোনো একটা ব্যাপার সব সময় চেপে যাচ্ছো আমার কাছে, যা তুমি বলতে চাও কিন্তু বলতে পারো না।

নূর!

হ্যাঁ আম্মু, আমি আজ তোমার কাছে শুনতে চাই...

মনিরা পুত্রের কথায় স্তব্ধ হয়ে যায়। এক সময় চেয়েছিলো বলবে সে সব কথা কিন্তু এ মুহূর্তে আর কিছু বলতে পারে না। কে যেন তার কণ্ঠ চিপে ধরেছে।

মনিরার মন জুড়ে একটা দুর্বলতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কেমন করে সত্য প্রকাশ করবে...

বলে উঠলো নূর—কি ভাবছো আম্মু?

মনিরার চোখ দুটো ম্লান অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

নূর মায়ের চিবুক ধরে উঁচু করে বলে—আম্মু, আমি লক্ষ্য করেছি, আব্বুর কথা তুললেই তুমি কেমন যেন আনমনা হয়ে যাও। আব্বু...

চুপ্ কর নূর, আর বলিস না। আমাকে রেখে আয়। আমাকে রেখে আয়...

আচ্ছা আম্মু, আর তোমাকে আব্বুর কথা বলে কষ্ট দেবো না। তারপর আপন মনেই বলে উঠে নূর—আমি জানি, আব্বু, এমন কোনো কাজ করেছেন বা করছেন যার জন্য তুমি মোটেই সন্তুষ্ট নও। আম্মু, আমি আব্বুকে যতটুকু জেনেছি চিনেছি তাতে তাঁকে মহৎ মহান ব্যক্তি বলেই আমার মনে হয়েছে। আব্বুর মধ্যে এক অসাধারণ পৌরুষ ভাব আমি দেখেছি যার কোনো তুলনা হয় না। তবু কেন, কেন তোমার সঙ্গে তাঁর এমন...

মনিরা পুত্রের কথাগুলো শুনছিলো, কোনো জবাব দিলো না।

নূর বলেই চলেছে—আব্বু, যেখানেই থাকুক এবং যাই করুক তিনি একদিন ফিরে আসবেনই। সত্যি আম্মু, আমি সেই দিনটির প্রতীক্ষা করছি......

মনিরার দৃষ্টিখানা সম্মুখ দরজা থেকে ফিরে এলো নূরের মুখের উপর। কত আশা কত বাসনা নূরের তার আব্বুকে সে কাছে পেতে চায়। কোন্ সন্তানের না ইচ্ছা হয় তার পিতাকে নিবিড় করে পেতে। পিতা-মাতার কাছে সন্তান যেমন প্রিয় তেমনি প্রিয় সন্তানের কাছে তার জনক জননী...

আম্মু, কি ভাবছো?

কিছু না!

আমার কাছে কেন তুমি নিজকে গোপন করতে চাও বলো তো? আম্মু আমি যে তোমার সন্তান...

নূর.......আমার নূর......

আম্মু, জানি তোমার বুকভরা ব্যথা, যে ব্যথা তুমি নীরবে হজম করে চলেছো?

সেদিন আর তেমন কোনো কথা হয় না। নূর নিজে গাড়ি চালিয়ে জননীকে পৌঁছে দেয় চৌধুরীবাড়িতে।

এক সময় পুত্রবধূর মুখে সব শোনেন মরিয়ম বেগম। দু'চোখে তাঁর নেমে আসে অশ্রুবন্যা। মনির তাঁকে শুধু কাঁদায়নি—কাঁদাচ্ছে মনিরাকে, কাঁদাচ্ছে সন্তান নূরকে।

মরিয়ম বেগম কি সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পান না।

মনিরা নিজের কক্ষে প্রবেশ করে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ভাবে কত কথা, নূর যদি এসে বলতো দস্যু বনহুর বন্দী হয়েছে তাতেও মনিরার মনে আশ্বাস বা সান্ত্বনা আসতো তার স্বামী জীবিত আছে। কতদিন সে স্বামীর খোঁজখবর পায় না, মনে ভীষণ একটা অস্বস্তি বোধ করছে মনিরা। তবে এই ব্যক্তি কে, যাকে পুলিশবাহিনী আটক করেছে? লোকটা নাকি পঙ্গু...

নানান চিন্তার মধ্য দিয়ে সময় কেটে চলে মনিরার। তার অন্তরে ব্যথার আগুন দাউ দুটি করে জ্বলতে থাকে, যে ব্যথার কথা সে স্পষ্টভাবে কাউকে বলতেও পারে না, শুধু গুমড়ে মরে আপন মনে।

ওদিকে নূর মাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো তার নিজ বাসায়। কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করেই চমকে উঠলো, তার টেবিলে গাঁথা রয়েছে একটা তীরফলক।

নূর বিস্মিত হলো।

তার বন্ধ ঘরে তীরফলক এলো কি করে!

নূর তীরফলকটা তুলে নিলো হাতে, তীরফলকে একটা কাগজের টুকরা গাঁথা রয়েছে, তাতে লেখা রয়েছে—সাবধান হুশিয়ারমত কাজ করবে।

নূর তীরফলকটা ভালভাবে লক্ষ্য করলো, তারপর চিঠিখানা পড়লো বারকয়েক তারপর হঠাৎ হেসে উঠলো অট্টহাসি। এই মুহূর্তে যদি সেই কক্ষে কেউ থাকতো বিস্মিত না হয়ে পারতো না। নূর আপন মনে হাসলো, তারপর আবার পড়লো কাগজের টুকরাখানা— সাবধান, হুশিয়ারমত কাজ করবে......

তীরফলকটা রাখলো টেবিলে। কাগজের টুকরাখানা পকেটে রেখে বসলো একটা চেয়ারে। আপন মনেই বললো—কে তুমি, স্বয়ং দস্যু বনহুর না অন্য কেউ?

নূর চেয়ারের হাতলে একস্থানে টিপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের অপর হাতলের ভিতরে থেকে বেরিয়ে এলো একটা ছোট্ট ক্যামেরা। নূর ক্যামেরার সুইচে টিপ দিতেই চেয়ারের হাতলের ভিতরে আলো জ্বলে উঠলো এবং অপর একটা সুইচে টিপ দিতেই দেয়ালের পর্দায় ছবি এসে পড়লো। জানালার শার্শী খুলে গেলো, ভিতরে প্রবেশ করলো এক তরুণ, তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। তরুণের বয়স তার চেয়ে কম মনে হচ্ছে। মাথায় ঝাকড়া চুল, প্রশস্ত ললাট, কানে দুটো বালা, দেহের পোশাক অদ্ভুত, হাতে তীর-ধনু। তরুণটি ধনুতে তীর সংযোজন করে তারপর তীর নিক্ষেপ করে কক্ষস্থ টেবিলের দিকে। তারপর বেরিয়ে যায় যে পথে কক্ষে প্রবেশ করেছিলো সেই পথে।

নূর সুইচ টিপে অফ্ করে দেয়।

ক্যামেরার আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের পর্দার আলোও মিশে গেলো।

নূর আপন মনে বলে উঠলো—কে এই তরুণ? দস্যু বনহুর তো নয়ই—তবে কে? নূর ভাবলো আপন মনে, তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে ফোন করলো পুলিশ অফিসে।

পুলিশ সুপার মিঃ হাকিম ছিলেন অফিসে, তিনি ফোন ধরলেন—হ্যালো, আমি পুলিশ সুপার বলছি—

বললো নূর—স্যার, বিস্ময়কর সংবাদ—আমার মাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে দেখি আমার টেবিলে একটা তীরফলক বিদ্ধ হয়ে আছে....

...বলেন কি মিঃ নূর?

...হাঁ। আমি আমার গোপন ক্যামেরা চালু করে রেখে বাইরে গিয়েছিলাম। যে সব ছবি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে তা বিস্ময়কর। এক তরুণের চেহারা...

...তরুণ...

...হাঁ স্যার, এক আশ্চর্যজনক তরুণ...মাথায় ঝাকড়া চুল, প্রশস্ত ললাট, দীপ্ত উজ্জ্বল তার চোখ দুটো....শরীরে বিস্ময়কর পোশাক।....

...শুনেছি দস্যু বনহুরের নাকি ঐ ধরনের চেহারা কিন্তু সে তো তরুণ নয়....

...স্যার, আমি নিজেও তাই ভাবছি কে সে—স্যার, শুধু তীরফলক নয় তীরফলকে গাঁথা আছে একটা ছোট্ট চিঠি....

...চিঠি...

...হাঁ স্যার...

...কি লেখা আছে তাতে?...ওপাশ থেকে প্রশ্ন করলেন পুলিশ সুপার মিঃ হাকিম।

নূর বলেই চলেছে...চিঠিতে লেখা আছে "সাবধান, হুশিয়ারমত কাজ করবে"...

...বিস্ময়কর বটে কে এই তরুণ যার এত দুঃসাহস। প্রখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ নুরুজ্জামান চৌধুরীর বেডরুমে...

...আমি নিজেই বিস্মিত হয়েছি এবং আপনাকে এ কারণে জানিয়ে দিলাম...আপনি জেনে রাখুন দস্যু বনহুর ছাড়াও আরও একজনের আবির্ভাব ঘটেছে যার দর্শন মিললো আমার গোপন ক্যামেরায়...

কে এই তরুণ? যাকে নিয়ে আমাদের গবেষণা শুরু হলো...

...হাঁ স্যার, এ কথা সত্য ও নতুন এক রহস্য বড় বিস্ময়কর ব্যাপার...আমি অফিসে আসছি, সব দেখে বলবো...

—আপনি আসুন, অনেক কথা শুনবার এবং বলবার আছে—কথাগুলো বললেন পুলিশ সুপার মিঃ হাকিম।

নূর রিসিভার রেখে কোটটা পরে নিলো গায়ে, তারপর দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললো।

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, নূর ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো। নূর প্রায়ই নিজে গাড়ি চালিয়ে এখানে সেখানে যেতো, বিশেষ প্রয়োজন না হলে সে ড্রাইভার নিতো না। অবশ্য নূরের এটা অভ্যাসও বলা যায়।

নূর যখন পুলিশ অফিস অভিমুখে রওয়ানা দিলো। তখন পুলিশ অফিসের মেঝেতে গভীর চিন্তাযুক্ত মনে পায়চারী করছিলেন পুলিশ সুপার মিঃ হাকিম।

নতুন এক চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে দলা বেঁধে উঠছে। দস্যু বনহুর ছাড়াও তাহলে নতুন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলো। কান্দাই শহরে দস্যু বনহুরকে নিয়ে পুলিশমহলে অস্বস্তির অন্ত নেই। মাঝে কিছুদিন দস্যু বনহুরের কোনো সাড়াশব্দ ছিলো না। তবে অন্যান্য দুস্কৃতিকারী বেশ

মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, দৌরাত্ম্য বেড়ে গেছে অসৎ ব্যবসায়ীদের। পুলিশমহলে এ নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা এবং তল্লাশি চলেছে তবু তেমন কোনো নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। মিঃ হাকিম এবং মিঃ জাহেদী এ ব্যাপার নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

এমন দিনে পুনরায় নতুন এক রহস্যের উৎপত্তি। শুধু মিঃ হাকিমই চিন্তিত নন, সমস্ত পুলিশমহলকে ভাবিয়ে তুলেছে ব্যাপারটা।

এমন সময় ফোন বেজে উঠে!

মিঃ হাকিম রিসিভার তুলে নেন হাতে।

ওপাশ থেকে ভেসে আসে শহর রক্ষীবাহিনীর প্রধানের কণ্ঠস্বর—স্যার, একটু পূর্বে শহরের সবেচেয় প্রধান রাস্তা দিয়ে এক অশ্বারোহী উল্কাবেগে চলে গেলো। তাকে আমরা কিছুতেই রুখতে পারলাম না।

মিঃ হাকিমের চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠলো, তিনি বলে উঠলেন—অশ্বারোহী...কতক্ষণ পূর্বে তাকে আপনারা আটক করার চেষ্টা করেছিলেন?....

...মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে গভীর রাত্রে হঠাৎ আমাদের কানে অশ্বপদশব্দ প্রবেশ করায় আমরা পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলি কিন্তু কোনো বাধাই তাকে ক্ষান্ত করতে পারলো না। আমরা ব্রাস ফায়ার করেও তাকে ঘায়েল করতে বা আটক করতে পারিনি।

আশ্চর্য বটে এক্ষুণি মিঃ নূর এসে পড়বেন, তাঁর কাছেও আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো—আচ্ছা, তদন্ত করে দেখা যাক রিসিভার রাখলেন মিঃ হাকিম।

আবার পুনরায় ফোন বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং করে। রিসিভার তুলে নিলেন মিঃ হাকিম—আমি পুলিশ সুপার বলছি...

ওপাশ থেকে শোনা গেলো ব্যস্ত কণ্ঠস্বর...স্যার, বড় আশ্চর্য সংবাদ—আমরা কান্দাই শহরের রুদ্র এলাকা থেকে বলছি—রুদ্র সেনা শিবিরের প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রধান....

বলুন কি সংবাদ—বললেন মিঃ হাকিম।

রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর তখন হটাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ—আমরা সজাগ ছিলাম এবং দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিলাম...

...তারপর...

...শব্দ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছিলো...আমরা বুঝতে পারলাম কোনো অশ্বারোহী আমাদের সেনানিবাসের পথ ধরে এগিয়ে আসছে—আমি প্রহরীদের নির্দেশ দিলাম তোমরা পথের মধ্যে প্রতিরোধ গড়ে তোলো—নির্দেশ অনুযায়ী পথে সুউচ্চ প্রতিরোধ প্রাচীন এনে রাখা হলো...

...তারপর?

অতি বিস্ময়কর ব্যাপার...অশ্বারোহী উল্কাবেগে এসে হাজির হলো যেন নিবাসের কাছাকাছি আমরা অস্ত্র নিক্ষেপ করবার পূর্বেই অশ্বারোহী তার অশ্ব নিয়ে সুউচ্চ প্রতিরোধ ডিংগিয়ে চলে গেলো...

একি বলছেন আপনারা...সব যেন যাদুমন্ত্র...শহর প্রতিরক্ষা বাহিনীদের কাছ থেকেও ঐ ধরনের কথা জানতে পারলাম। অশ্বারোহী নাকি তাদের ত্রাসফায়ার উপেক্ষা করে স্বচ্ছন্দে শহরের প্রধান পথ বেয়ে চলে গেছে—

—হাঁ, ঠিক আমাদের এখানেও তেমনি কান্ড—অশ্বারোহী তার অশ্ব নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে এবং তাকে কোনোরকম বাধা দেবার পূর্বেই সে সুউচ্চ প্রতিরোধ প্রাচীর ডিংগিয়ে চলে যায়। আমরা হতবাক হয়ে গেছি কি করে এত উচ্চ প্রতিরোধ প্রাচীর ডিংগিয়ে অশ্বারোহী চলে গেলো...আমরা অশ্বারোহীকে ফলো করেও আর কিছু করতে পারিনি....ব্যর্থ হয়েছি...কান্দাই সেনাবাহিনী এমনভাবে পরাজিত হয়নি কোনোদিন...

মিঃ হাকিম স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিলো, আস্তে করে রিসিভার রেখে দিলেন, কোনো কথা আর বললেন না তিনি।

এমন সময় পুলিশ অফিস প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলো একখানা গাড়ি।

মিঃ হাকিম বুঝতে পারলেন এ গাড়ি মিঃ নূরের।

অল্পক্ষণেই অফিসকক্ষে প্রবেশ করলো নূর। মিঃ হাকিম করমর্দন করলেন নূরের সঙ্গে।

❑

অশ্বপদশব্দ শোনামাত্র আশা কুটির হতে বেরিয়ে এলো। লণ্ঠন হাতে দাঁড়ালো আশা কিন্তু একি, জাভেদের সঙ্গে আরও এক ব্যক্তি। আশা তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

হাত দু'খানা পিছমোড়া বাঁধা।

অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো জাভেদ এবং তার সঙ্গী।

আশা লণ্ঠন উঁচু করে ধরবার পূর্বেই জাভেদ—আশা আম্মু, তুমি যাকে চাও তাকে ধরে নিয়ে এসেছি...

আশা তাকিয়ে দেখলো জাভেদের পাশে হাত দু'খানা পিছমোড়কে বাঁধা স্বয়ং বনহুর।

লণ্ঠনের আলোতে আশা সহসা দৃষ্টি নত করে নিতে পারলো না।

জাভেদ নিশ্চুপ।

আশা বললো—জাভেদ, এ তুমি কি করেছো!

বললো জাভেদ—আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, পালন করেছি।

জাভেদ!

হাঁ আশা আম্মু। তুমি জানো না আমি তোমার জন্য সব করতে পারি!

তাই বলে তুমি...

হাঁ, আমি বাপুকে পাকড়াও করে এনেছি। খুলে দিচ্ছি বাপুর হাতের বাঁধন, যা বলতে চাও বলো।

জাভেদ কোমরের বেল্ট থেকে ছোরা নিয়ে বনহুরের হাত দু'খানা মুক্ত করে দিলো। তারপর চলে গেলো সে অন্যদিকে।

বনহুর জাভেদের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনলো, গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো সে, তারপর ফিরে তাকালো আশার দিকে।

না না, আমি তোমার কাছে কিছু বলতে চাই না কিছু বলতে চাই না। কথাটা বলে আশা ওদিক মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

ঠিক আশার পেছনে।

বললো—আশা, কিছু বলতে না চাইলেও কিছু বলতে হবে তোমাকে।

না, আমি কিছু বলবো না।

তবে কেন জাভেদকে উদ্বুদ্ধ করেছো আমাকে পাকড়াও করে আনতে?

তুমি ভুল বুঝছো বনহুর, আমি জাভেদকে মোটেই উদ্বুদ্ধ করিনি এ ব্যাপারে। আমি জানিও না যে সে তোমাকে....

এভাবে বন্দী করে আনবে। আশার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো বনহুর। এবার আশার পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো সে। চিবুকটা উঁচু করে ধরলো আশার, তারপর একটু কঠিন কণ্ঠে বললো—নূরী নিজ সন্তান দিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে তবু তুমি সন্তুষ্ট নও!

বনহুর, তুমি ভুল বুঝেছো।

না, আমি ভুল বুঝিনি। তুমি বেশ কয়েকবার আমার জীবন রক্ষা করেছো, সেই দাবি নিয়ে তুমি...

জাভেদকে উৎসাহিত করেছি তোমাকে পাকড়াও করে আনতে। তুমি বিশ্বাস করো এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই।

আশা, জাভেদ কি তাহলে এমনি অকারণে আমাকে এভাবে আটক করে তোমার কাছে এনে হাজির করেছে?

আমি কিছু জানি না, বিশ্বাস করো আমি কিছু জানি না।

আশা, তুমি মনে করোনা আমি কিছু বুঝি না।

বনহুর, আমি সব সহ্য করতে পারবো কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝবে তা সহ্য করতে পারবো না। আশা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

কিছুক্ষণ বনহুর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আশার কান্না তার হৃদয়কে বিচলিত করলো। সত্যি আশা তার জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করেছে। ত্যাগ করেছে নিজের জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা...জীবন-যৌবন...নিজকে সে বিলিয়ে দিয়েছে জনগণের মঙ্গল চিন্তায়-বহু জনকল্যাণ কাজ সে করেছে যার জন্য তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। এমন কি বনহুরের কানেও এ কথা গিয়ে পৌঁছেছে। আশা ভালবেসেছিলো বনহুরকে, কিন্তু সে ভালবাসা বনহুর গ্রহণ করেনি। তবু আশা দূর থেকে তাকে ভালবেসে গেছে—প্রতিদানে বনহুর তাকে কি দিয়েছে—বরং উপেক্ষাই পেয়েছে সে সারা জীবনভর—বনহুর জানে, আশা তাকে কত ভালবাসে! আশার প্রতি করুণা হয় বনহুরের, বলে সে—আশা, আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি, জানি তুমি আমাকে ভালবাসো, আর সেই কারণে তুমি মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলো। হয়তো বা তুমি জাভেদকে এমন কথা বলেছো যার জন্যে সে বাধ্য হয়েছে আমাকে কৌশলে বন্দী করে আনতে—

এবার আশা সোজা হয়ে মুখ তুলে দাঁড়ালো, বলে—আমি কোনো সময় তাকে এমন কিছু বলিনি যার জন্য সে তোমাকে এভাবে বন্দী করে আনবে। বিশ্বাস করো আমি জাভেদকে পেয়ে ভুলে গেছি আমার জীবনের সব কথা—

আশা!

হাঁ, বনহুর।

কিন্তু—

না, কোনো কিন্তু নেই এর মধ্যে। আমি পূর্বেও বলেছি আজ বলছি, তোমাকে আমি ভালবাসি, তবে পেতে চাই না, কারণ জানি তুমি আমাকে ভালবাসতে পারোনি, পারবেও না কোনোদিন—

আশা, আমাকে তুমি জানো, আমি বড় হতভাগ্য, কাউকে ভালবাসতে পারলাম না—

বনহুর, তুমি হতভাগ্য নও, তুমি বড় সৌভাগ্যবান পুরুষ। তোমাকে নিয়ে সবাই ভাবে আর তোমার কাউকে নিয়ে ভাবার সময় নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আশা, তারপর আবার বলে—জাভেদ যে তোমাকে এভাবে পাকড়াও করে নিয়ে আসবে এ আমি ভাবতে পারিনি। বনহুর, তুমি আমাকে ক্ষমা করো—

আশা!

বলো?

তোমার কাছে আমি একটা অনুরোধ জানাবো।

অনুরোধ নয়, আদেশ করো বনহুর—

বনহুর উঠানের একপাশে একটা পাথরখন্ডে বসে পড়ে আশাকে পাশে বসতে বললো!

আশা বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে না বসে একটু দূরে বসলো।

ছায়াঘন উঠান।

নানা ধরনের বৃক্ষলতাগুল্মে ভরা সুনিবিড় মনোরম স্থান।

সামনে প্রশস্ত প্রান্তর।

তিন পাশে ঘন জঙ্গল।

অদূরে জাভেদের অশ্ব ঘাস খাচ্ছে।

বললো বনহুর আশা নিজের জীবন নিয়ে আমি জুয়া খেলছি। কোন্ মুহূর্তে আমি পরাজিত হবো যমরাজের কাছে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই আমি চাই আমার জাভেদ যেন আমার মত নিজকে সমাজের কাছে হেয় না করে। আশা, ওকে তুমি মানুষ করে তোলো, এই আমি চাই।

আশা বললো—এ বিশ্বাস তুমি আমার উপর রাখতে পারো, তোমার জাভেদ ভুলপথে যাবে না। সে সত্যিকারের মানুষ রূপে গড়ে উঠবে।

আশা! বনহুর আশার দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে শান্ত কণ্ঠে বললো—তোমার কাছে জাভেদ রয়েছে যখন জানতে পারলাম তখন আমি

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছি, কারণ জানি তোমার সান্নিধ্য ওকে সুষ্ঠু মানুষ রূপে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে এবং সে বিশ্বাস আমার আছে—

বনহুর, আমি তোমাকে কথা দিলাম তোমার বিশ্বাস অটুট থাকবে।

আশা!

হাঁ বনহুর।

আশা, তুমি শুধু আমার জীবনরক্ষাকারিণীই নও, তুমি আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী—

বনহুর, আমার জীবন তোমার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি।

কিন্তু আমি তো তোমাকে কিছু দিতে পারিনি আশা?

দুঃখ নেই, তুমি আমাকে স্মরণ রেখেছো এটাই আমার চরম পাওয়া।

নারীজাতির উজ্জ্বল নক্ষত্র তুমি আশা। জনগণের মঙ্গল তোমার কামনা এবং সে কারণেই আমি তোমাকে—

বলো, থামলে কেন?

আশা, তোমার উপর আমার অনেক ভরসা। বনহুর কথাটা বলে নিশ্চুপ হয়ে যায়, গভীরভাবে কিছু ভাবতে থাকে।

দু'চোখে অন্তর জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে থাকে আশা তার প্রিয় বনহুরের দিকে।

কতদিন পর একান্ত পাশে পেয়েছে আশা তাকে। সে ভাবতেও পারেনি জাভেদ বনহুরকে বন্দী করে সরাসরি তার সম্মুখে হাজির করবে।

আশা বিস্মিত হয়েছে, দুর্ধর্ষ বনহুরকে জাভেদ কি করে আটক করলো এবং কি করে তাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে এতপথ এলো—

আশাকে ভাবতে দেখে বললো বনহুর—কি ভাবছো?

আশা বললো—তোমার পুত্রের কাছে তুমি পরাজিত, এ কথা ভাবতে আমার লজ্জা করছে আর ভাবছি কেমন করে সে তোমাকে বন্দী করলো?

ও, এই কথা! একটু হাসলো বনহুর।

আশা গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমি জানতাম কেউ তোমাকে আটক করতে পারবে না, কিন্তু...

বনহুরের মুখমন্ডলে একটা দীপ্ত ভাব ছড়িয়ে পড়ে, সে আশার চিবুকটা তুলে ধরে বলে—তোমার চিন্তার বিষয় এবার আমি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি আশা। জাভেদ আমাকে কিভাবে গ্রেপ্তার করলো সে এক বিস্ময়কর বাহিনী। তুমি শুনবে?

হাঁ বনহুর।

বনহুর এবার উঠে দাঁড়ালো এবং পাথরখন্ড ত্যাগ করে একপাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো—আশা, মিস মিনারার সন্ধানে আমি আর রহমান এসেছি হীরা নগরীতে। উদ্দেশ্য মিস মিনারাকে উদ্ধার করা...হাঁ, আমি হীরা নগরীতে এসেই জানতে পেরেছিলাম মিস মিনারা মির্জার উদ্ধার ব্যাপারে শুধু আমি ও রহমান নই, আরও কেউ এ ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে...এবং পরে বুঝতে পারি তোমার অদৃশ্য হাত কাজ করছে। আশা, ভাস্কর মাইথী যখন তীরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলো তখনই আমি বুঝতে পেরেছি সবকিছু। কারণ তীরফলক হাতে নিয়েই আমি—একটু থেমে বলে বনহুর—তোমার সহযোগিতা ছাড়া হয়তো আমার এ যাত্রাও পরাজয় ঘটতো।

এ ধারণা তোমার ভুল আমি নই জাভেদ। মিস মিনারা মির্জার উদ্ধারে জাভেদ এগিয়ে গিয়েছিলো এবং তোমার আগমন সংবাদ সে-ই আমাকে জানিয়েছিলো।

কিন্তু—

হাঁ, আমিও জানতাম তুমি আসবে তবে সে আমার মনের কথা। শুধু জাভেদের উপর নির্ভর করে আমি নিশ্চুপ ছিলাম না। জাভেদ যখন কাজে এগিয়ে গেছে বা যায় তখন আমি তার অগোচরে কাজ করি...

আশা, তাহলে তোমার ইঙ্গিতেই জাভেদ এগিয়ে গিয়েছিলো হীরার প্রেসিডেন্ট-কন্যা মিস মিনারা মির্জার উদ্ধার ব্যাপারে?

তোমার অনুমান কিছুটা সত্য। তবে জাভেদ তোমার সন্তান, তাই তার গতিবিধি তোমার মতই বনহুর।

আশা, একদিন আমি বলেছিলাম আমার সন্তান জাভেদ ঠিক আমার মতই হবে, তার ধমনিতে যে আমারই রক্ত। কিন্তু আজ আমি তা চাই না......

আশা নীরব নিশ্চুপভাবে শুনে যাচ্ছে বনহুরের কথাগুলো।

বনহুর বলে চলেছে—জাভেদ আমার মত দস্যু হোক এ আমি চাই না আশা!

বনহুর ফিরে আসে আশার পাশে, আশার একখানা হাত তুলে নেয় হাতের মুঠায়—নিশ্চুপ থেকো না আশা! বলো জাভেদকে তুমি সৎ মহৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে?

বনহুর, জাভেদ তোমার সন্তান, তার দেহে আছে তোমারই রক্ত কাজেই সে তোমার মতই মহৎ সৎ পবিত্র চরিত্রের মানুষ হবে তাতে কোনো ভুল নেই।

আশা, তুমি আমাকে সৎ মহৎ পবিত্র চরিত্রের মানুষ বললেও আমি তা মেনে নিতে পারছি না, কারণ আমি নিজে জানি আমি কি এবং কেমন। আশা, এ কথা শুধু তুমি নও, আমি বহু জনের মুখে শুনে আসছি তবুও মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারি না। আশা, একদিন মনে করতাম জাভেদ আমার মত দুর্ধর্ষ দস্যু হিসেবে গড়ে উঠুক কিন্তু আজ আমার সে মন নেই যা কিছুক্ষণ পূর্বেও তোমাকে বলেছি। কথাটা আমি পুনরাবৃত্তি করলাম, আমি চাই জাভেদকে তুমি......

যা বলতে চাচ্ছো তাই হবে বনহুর!

আশা!

হ্যাঁ।

জানি না তুমি সার্থক হবে কি না।

তোমার আশীর্বাদ আমাকে জয়ী করবে বনহুর। কথাটা বলে আশা চলে যাবার জন্য কুটিরের দিকে পা বাড়ায়।

বনহুর বলে উঠলো—আশা, যা শুনতে চাইছিলে তা না শুনেই চলে যাচ্ছো? শোনো আশা।

ফিরে দাঁড়ায় আশা।

বনহুর আশাকে লক্ষ্য করে বলে—প্রেসিডেন্ট কন্যা মিস মিনারা মির্জাকে উদ্ধার করে আমি যখন তাজের সন্ধানে হীরা পর্বতে ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

আশা বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়।

বনহুর বলে চলে—সন্ধ্যার অন্ধকারে হীরা পর্বতের পাদমূলে এসে দাঁড়িয়েছি। মিস মির্জাকে তার পিতা-মাতার কাছে পৌঁছে দিয়ে মনে অনাবিল শান্তি উপভোগ করছি কিন্তু অন্তরটা ব্যথায় জর্জরিত, কারণ আমার তাজ পাশে নেই! তাজকে কোথায় আটক করে রাখা হয়েছে আমি জানি না। তাই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এগুচ্ছিলাম। ঠিক ঐ মুহূর্তে আমি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি......এমন সময় আমার পিঠে ঠান্ডা কোনো বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করে চমকে ফিরে তাকাই......দেখতে পেলাম মুখোশে মুখ ঢাকা এক ব্যক্তি আমার পিঠে হিমশীতল পিস্তলের নল চেপে ধরে আছে।

ফিরে তাকাতেই বললো সেই অদ্ভুত ব্যক্তি—এক চুল নড়লে গুলী তোমার বক্ষ ভেদ করে চলে যাবে, কাজেই—

কণ্ঠস্বর আমাকে তার পরিচয় জানিয়ে দিলো, আমি একটু হাসলাম মাত্র।

তারপর?

তারপর সে আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে আমাকে তার অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিলো।

তুমি এত সহজে—

ধরা দিলাম, এই তো?

হাঁ।

মুখোশ পরিহিত ব্যক্তির পরিচয় যখন তার কণ্ঠস্বরে পেয়ে গেলাম তখন আপত্তির কোনো কারণ ছিলো না! বরং একটা জানার বাসনা মনকে উৎসাহিত করে তুললো!

তুমি তাহলে জাভেদের হাতে নিজকে স্বইচ্ছায়......

হাঁ আশা, আমি নিজকে স্বইচ্ছায় জাভেদের কাছে সমর্পণ করেছিলাম।

তাই বলো! জাভেদ তোমাকে আটক করে নিয়ে এলো আর তুমি কচি শিশুর মত তার সঙ্গে চলে এলে! সত্যি তুমি অদ্ভুত মানুষ।

জাভেদ কোথায় নিয়ে আসে এবং তার উদ্দেশ্য কি, এটাই জানার প্রবল ইচ্ছা আমাকে নীরব থাকতে বাধ্য করেছিলো। আশা, আমি জানতাম জাভেদ তোমার স্নেহের বন্ধনে আটকা পড়েছে। সে ভুলে গেছে মায়ের স্নেহ-ভালবাসা......

না, সে মাকে ভুলেনি, ভুলেনি তোমাকে, ভুলেনি তোমার অনুচরদের। সবাইকে জাভেদ মনে রেখেছে। প্রায়ই সে বলে তোমাদের কথা, ছুটে যেতে চায় কান্দাই শহরে কিন্তু আমি তাকে যেতে দেই না। আমি যে তাকে বোন নূরীর কাছ থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে এসেছি। জানো বনহুর, আমি ওর মধ্যে খুঁজে পেয়েছি তোমাকে......

আশা!

বনহুর তোমাকে স্পর্শ করার সাহস আমার নেই।

আশা তুমি...

হাঁ বনহুর।

বনহুর, আশার চিবুকটা উঁচু করে ধরে বলে—সত্যি তুমি অপূর্ব অদ্ভুত নারী...

তোমাকে ভালবেসে আমি জয়ী হয়েছি—জীবন আমার ধন্য হয়েছে...

কিন্তু...তুমি তার বিনিময়ে কি পেয়েছো আমার কাছে? শুধু দুঃখ আর ব্যথা—

বনহুর, সে দুঃখ আর ব্যথা আমার অহংকার। জীবনে কোনো পুরুষকে আমি ভালবাসিনি বা ভালবাসতে পারিনি। শুধু তুমি আমার হৃদয় জয় করেছিলে, তাই—

আশা—আবেগজড়িত বনহুরের কণ্ঠস্বর।

তাই আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে, কোনো পুরুষকে বুঝি না। তুমিই আমার স্বপ্ন, আমার সাধনা......কথাটা বলে আশা দ্রুত চলে যায় সেখান থেকে।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর এগিয়ে যায় কুটিরের দিকে, আবেগভরা কণ্ঠে ডাকে আশা......

ততক্ষণে আশা কুটিরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

বনহুর ফিরে আসে দরজার পাশ থেকে।

তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় সেখান থেকে। কাছেই ছিলো জাভেদের অশ্ব, সেই অশ্বের পাশে এসে দাঁড়ালো।

জাভেদ উঠানে প্রবেশ করে কাউকে না দেখে কুটিরের দরজায় আঘাত করে ডাকে—আশা আম্মু, দরজা খোলো, দরজা খোলো—

আশা তখন দরজা না খুলে পারে না।

সে দরজা খুলে দিতেই জাভেদ তাকায় আশার মুখের দিকে। শিশিরসিক্ত রজনীগন্ধার মত অশ্রুসিক্ত মুখ। গন্ড রক্তজবার মত লাল হয়ে উঠেছে, চোখ দুটোও লাল, এলোমেলো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে কাঁধে পিঠে ললাটে।

জাভেদ বলে—আশা আম্মু, তুমি কাঁদছো? আমি বুঝতে পেরেছি বাপু তোমাকে অপমান করেছে।

না, সে আমাকে অপমান করেনি।

তবে কি হয়েছে বলো?

না জাভেদ, তুমি কিছু জানতে চেও না। আমি কিছু বলতে পারবো না তোমাকে। আশা পুনরায় কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে নিজের বিছানায় বসে পড়ে।

জাভেদ আশার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে—আশা আম্মু, বাপুকে আমি নিয়ে এলাম শুধু তোমার জন্য কিন্তু বাপু তোমাকে...

না জাভেদ, তুমি তাকে ভুল বুঝো না। সে আমার জীবনের স্বপ্নসাধনা...তোমার বাপু মানুষ নয়, দেবতা! আমি তাকে পূজো করি কিন্তু তাকে পেতে চাই না...

জাভেদ নিশ্চুপ, একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বের হলো না। ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলো কুটির থেকে।

জাভেদের কানে ভেসে আশে অশ্বপদশব্দ, বুঝতে পারে সে তার বাপু বিদায় নিয়ে চলে গেছে। এ অশ্বপদশব্দ তারই অশ্বের।

❑

হীরপর্বতের পাদমূলে দাঁড়িয়ে শিষ দিলো বনহুর। একবার দু'বার তিন বার কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না বা তাজের চিঁহি শব্দ এলো না!

বনহুর জাভেদের অশ্বকে ছেড়ে দিয়ে বললো যাও ফিরে যাও তোমার প্রভুর পাশে। কথাটা বলে সে জাভেদের অশ্ববল্গা মুক্ত করে দিলো।

জাভেদের অশ্ব মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে শুরু করলো, বন জঙ্গল প্রান্তর ডিংগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অশ্বটি তার প্রভুর নিকটে। এতক্ষণ বনহুরকে সে আপন পিঠে বহন করে আনলেও তার আনন্দ ছিলো না, এবার সে পরম আনন্দে ফিরে চলেছে।

ওদিকে বনহুর তাজের সন্ধান করে ফিরছে হীরাপর্বতে কোথায় তার তাজ, কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছে বনহুর। পর্বতের পাদমূলে এবং পর্বতের গায়ে সমতল স্থানগুলো সে চষে ফিরতে লাগলো।

একদিন দু'দিন করে চার দিন চার রাত্রি কেটে গেলো বনহুরের। পর্বতের অপর পৃষ্ঠে এসে পড়লো সে এক সময়।

এদিকটা বনহুরের কাছে বড় নীরব লাগলো।

একটা জীবজন্তুও নজরে পড়লো না তার। অদূরে একটা জলপ্রপাত। বনহুর জলপ্রপাতের পাশে এসে দাঁড়ালো। প্রাণ ভরে পানি পান করলো সে। হঠাৎ তার নজর চলে গেলো সম্মুখের জলপ্রপাতের পাশে পর্বতের গায়ে এক স্থানে পানি ঘুরপাক খেয়ে পর্বতের ভিতরে প্রবেশ করছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে দেখলো এবং তৎক্ষণাৎ ভেবে নিলো নিশ্চয়ই সেখানে কোনো গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সে জলপ্রপাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সাঁতার কেটে সেই ঘুরপাক কাওয়া স্থানের দিকে এগিয়ে চললো। প্রপাতের পানিতে ঝাপিয়ে পড়তেই একটা ভীষণ আকর্ষণ অনুভব করলো সে।

নিজকে কতকটা ছেড়ে দিলো বনহুর জলপ্রপাতের পানিতে।

প্রবল টানে বনহুর অল্প সময়ে সেই ঘুরপাক খাওয়া স্থানে এসে পৌছে গেলো। জলপ্রপাতের জলধারা সেই স্থানের কোনো গহ্বরে প্রবেশ করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুরের তখন ভাববার অবকাশ নেই, ঘূর্ণীয়মান জলধারার সঙ্গে জলপ্রপাতের গভীরে তলিয়ে গেলো।

মাত্র কয়েক মিনিট, বনহুরের নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি ভেসে উঠার চেষ্টা করলো।

কিন্তু পারলো না।

একটা জাল তার দেহকে আবদ্ধ করে ফেললো।

পর মুহূর্তে তাকে শূন্যে তুলে নেওয়া হচ্ছে এই ধরনের অনুভূতি বনহুর অনুভব করলো। সে বেশ বুঝতে পারলো তাকে বন্দী করা হচ্ছে।

জাল সহ বনহুর যখন শূন্যে ভেসে উঠলো তখন সে দেখতে পেলো চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। সমস্ত শরীর ভিজে চুপসে গেছে, চুল দিয়ে পানি ঝরছে। জালটা তাকে শুকনো মাটিতে নামিয়ে দিলো।

বনহুর নিঃশ্বাস নিলো প্রাণভরে।

এতক্ষণ গভীর জলোচ্ছ্বাসের তলায় দম বন্ধ হয়ে আসছিলো, আর কিছুক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে তার মৃত্যু ঘটতো।

জালটা তাকে জলপ্রপাতের জলোচ্ছ্বাস থেকে টেনে তুলে নিলো এবং শুকনো স্থানে নামিয়ে দিলো। বনহুর চোখ দুটো রগড়ে নিলো ভালভাবে তারপর হাতড়ে হাতড়ে চলতে লাগলো সম্মুখ দিকে।

কিছুটা এগুতেই একটা ঝক ঝক শব্দ কানে এলো তার। অদ্ভুত শব্দ, বনহুর অন্ধকারে হাতড়ে চলেছে, কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। শব্দটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসছে সম্মুখে একটা দেয়াল পথ রোধ করে দিলো।

বনহুরের মাথাটা ঠুকে গেলো ভীষণভাবে।

বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে দেয়ালে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলো। হঠাৎ একটা সুইচে হাত লাগলো বনহুরের, সে বুঝতে পারলো এ সুইচটার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। বনহুর সুইচে চাপ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের দেয়াল বা প্রাচীরটা ধীরে ধীরে সরে গেলো একপাশে।

বনহুর বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো দেয়ালের ওপাশে একটা সুড়ঙ্গপথ। বনহুর সেই সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলো এবং এগিয়ে চললো। এবার পূর্বের চেয়ে কিছুটা হাল্কা অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে! সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

সুড়ঙ্গ থেকেই শব্দটা আসছে। অল্পক্ষণেই দেখলো বনহুর, সুড়ঙ্গের একপাশে একটা গুহা, সেই গুহার ভিতর থেকেই শব্দটার সৃষ্টি।

বনহুর অতি সাবধানে সুড়ঙ্গের দেয়ালে পিঠ রেখে ধীরে ধীরে গুহার মুখে এসে উঁকি দিলো। গুহার ভিতর ঝাপসা আলো ছটা ছড়িয়ে আছে।

সে অস্পষ্টভাবে দেখলো, কতগুলো কল ঘর ঘর করে একটানা ঘুরে চলেছে। তার উপরে দৃষ্টি পড়তেই বনহুর চমকে উঠলো, শিউরেও উঠলো সে নিজের অজান্তে। স্পষ্ট দেখতে পেলো ঝুলন্ত কতকগুলো মৃতদেহ থেকে গ্যাস দ্বারা মাংস ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে। একটা ভ্যাপসা উৎকট গন্ধ বনহুরের নাকে প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের পিঠে নাক চেপে ধরলো সে।

কি ভীষণ ব্যাপার!

বনহুর নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। মৃতদেহগুলোর গলায় লৌহশিকল আটকানো রয়েছে! কোনোটার দেহের মাংস সম্পূর্ণ ঝরে পড়েছে, কোনোটার দেহে কিছু কিছু মাংসের শেষ অংশ লেগে আছে। আবার কোনোটার সম্পূর্ণ কঙ্কালে পরিণত হয়েছে...বনহুর এ দৃশ্য লক্ষ্য করে আপন মনে বলে উঠলো—সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে এমন রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে সত্যি এটা বিস্ময়কর বটে...কথাটা বলে এগুতে থাকে বনহুর। চিন্তাজাল তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, এ মৃতদেহগুলো কোথা থেকে আসছে প্রায় পঞ্চাশটা মৃতদেহ কঙ্কালে পরিণত হয়েছে বা হতে চলেছে। ওপাশে আরও নরদেহ ঝুলছে, সেগুলোকেও কঙ্কালে পরিণত করা হবে...এত লোককে হত্যা করা হয়েছে।

বনহুর পাশের গুহায় প্রবেশ করে।

ঝুলন্ত কঙ্কালগুলো যখন দুগ্ধধবল আকার ধারণ করছে তখন সেই কক্ষ বা গুহা থেকে পাশের গুহায় চলে যাচ্ছে। যেন কঙ্কালগুলো পা পা করে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছে শূন্য দিয়ে।

বনহুর বুঝতে পারলো মৃতদেহ থেকে মাংস গলিয়ে ফেলার এক অদ্ভুত মেশিন আর সেই মেশিন থেকেই উৎকট ধরনের শব্দ বের হচ্ছে। যে শব্দ তাকে আকৃষ্ট করেছে এই সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে আনতে!

পাশের গুহায় প্রবেশ করে বনহুর আরও অবাক হলো। কতকগুলো মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় ঝুলছে এবং ধীরে ধীরে পাশের গুহার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গুহার দেয়ালে লম্বালম্বি একটা পথ, সেই পথ দিয়ে ঝুলন্ত লাশগুলো প্রবেশ করছে ওপাশে এবং স্বয়ংক্রিয় গ্যাস দ্বারা কঙ্কালে পরিণত করা হয়েছে। তারপর কঙ্কালগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে ওদিকের লম্বালম্বি পথ দিয়ে অপর এক গুহার দিকে।

বনহুর তীক্ষ্ণভাবে সব লক্ষ্য করলো।

বেশি বিস্মিত হলো সে কি কারণে তাজা লাশগুলোকে কঙ্কালে পরিণত করা হচ্ছে এবং কিভাবে মেশিনগুলো আপনা আপনি কাজ করছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো অদৃশ্য ইঙ্গিতে সব হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এত মৃতদেহ আসছে কোথা থেকে!

বনহুর যে পথে ভিতরে প্রবেশ করেছে সে পথে কেউ কোনোদিন আসতে পারে, এমন ধারণা বোধহয় এই রহস্যময় সুড়ঙ্গপথের বাসিন্দারা জানে না তাই তারা নিশ্চিন্ত।

কোথায় অবস্থান করে এরা কাজ করছে জানার জন্য বনহুর উৎসাহিত হয়ে উঠলো। ওদিকে যাবার জন্য পা বাড়ালো সে, ঠিক ঐ মুহূর্তে দেখলো সে, তিনজন লোককে পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় দু'জন ভীষণ চেহারার লোক একটা গুহায় প্রবেশ করলো।

পর্বতের গহ্বরে যে এমন এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে চলেছে তা ভাবতেও যেন অবাক লাগে। বনহুর আড়ালে আত্মগোপন করে সেই গুহার পাশে এসে দাঁড়ালো। সম্মুখে একটি ছিদ্র পথে বনহুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ঐ গুহার ভিতরে যে গুহায় একটু পূর্বে হাত পিছমোড়া করে বাঁধা তিনজন লোককে আটক করে আনা হলো।

গুহার ভিতরে নজর পড়তেই দেখলো, ঐ তিনজন যাদের হাত বাঁধা অবস্থায় ধরে আনা হলো তাদের একপাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এক একজনের মুখমন্ডলের অবস্থা বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। ভয়বিহ্বল চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে। একপাশে লম্বামত টেবিল, সেই টেবিলে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে। গুহার দেয়ালের ধার দিয়ে নতুন ধরনের টেবিল। টেবিলের উপরে অনেকগুলো কাঁচের জার সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে।

একটি বড় জার, তার মধ্যে তাজা লাল রক্তের মত কোনো বস্তু নজরে পড়লো। জারটার মুখ বন্ধ কিন্তু মুখের ভিতর থেকে একটা নয় অসংখ্য

কাঁচের নল বেরিয়ে এসেছে। পাশে একটা লম্বালম্বি টেবিলের উপর কিছু মেশিনপত্র রয়েছে।

একটা লোককে শুইয়ে দেওয়া হলো।

লোকটা আর্তনাদ করে উঠলো কিন্তু তাকে কোনো রকম শব্দ উচ্চারণ করতে দেওয়া হলো না।

চীৎ করে শুইয়ে দেওয়ার পর তার পা দু'খানাও বেঁধে দেওয়া হলো লম্বা করে। হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা ছিলো তা খুলে দু'পাশে টেবিলে আটকানো হলো যেন নড়াচড়া করতে না পারে। তারপর একটা চাকাযুক্ত মেশিন এগিয়ে আনা হলো শায়িত লোকটার পাশে। যেভাবে সেলাইন দেওয়া হয় সেইভাবে লম্বা একটা সুইচ মেশিনটার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো, সেই সুইচটা লোকটার বুকের ডান পাশে প্রবেশ করিয়ে দিলো।

যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করলো শায়িত লোকটা।

মেশিনের ওপাশে একটি সুইচে চাপ দিতেই মেশিন চালু হয়ে গেলো। সাদা নলটা সঙ্গে সঙ্গে লাল রঙে পরিণত হলো। তাজা লাল রক্ত এসে টেবিলে সংরক্ষিত কাঁচের জার পূর্ণ হয়ে চললো।

বনহুর পাশের গুহা থেকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখতে লাগলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লোকটার দেহ থেকে রক্ত শুষে নেওয়া হলো।

লোকটা প্রথমে ছট্‌ফট্‌ করার চেষ্টা করলো, তারপর ক্রমে অবশ শিথিল হয়ে এক সময় নীরব হয়ে গেলো ওর দেহটা।

কি ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক দৃশ্য।

লোকটা সম্পূর্ণ রক্তশূন্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত পা মুক্ত করে তার গলায় লৌহশিকল পরিয়ে দেওয়া হলো। অপর একটা সুইচে চাপ দিতেই লৌহশিকল সহ লাশটা শূন্যে ঝুলে পড়লো।

বনহুর অবাক হলো কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত হবে না, অপর এক ব্যক্তির হাত দু'খানা মুক্ত করে জোরপূর্বক টেবিলে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

লোকটা করুণভাবে প্রাণভিক্ষা করছে।

বয়স তার ত্রিশ-বত্রিশ হবে বলিষ্ঠ চেহারা। লোকটার চোখে মুখে আভিজাত্যের ছাপ বিদ্যমান।

লোকটাকে টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হলো।

হাত দু'খানা দু'পায়ে বেঁধে ফেললো ক্লিফ দিয়ে। পা দু'খানা যখন বাঁধার উদ্যোগ করছে তখন বনহুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো শয়তান লোক দু'জনের উপরে। প্রচন্ড ঘুষি বসিয়ে দিলো তাদের নাকেমুখে চোখে।

লোক দু'জন প্রথমে একেবারে হতভম্ব হলেও পরক্ষণেই নিজেদের সামনে নিয়ে তারা পাল্টা আক্রমণ করলো বনহুরকে। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো, পাশেই শায়িত লোকটা তাকিয়ে আছে, তার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। আর একজন তখনও হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা ভাবছে একি ব্যাপার, কে এই লোকটা এগিয়ে এসেছে তাদের জীবন রক্ষার্থে।

বনহুর এমনভাবে আক্রমণ করেছে ওরা কেউ যেন কোনো অস্ত্র বা মেশিনে হাত দিতে না পারে।

বনহুর জানে এখানে যে মেশিনগুলো রয়েছে সবগুলো মেশিন আশ্চর্যজনক। বনহুর একটা মেশিন পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হলো এবং সম্মুখস্থ টেবিলে ভীষণ আওয়াজ করে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো রক্ত ভরা কাঁচের জারটা।

জারটা চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোক দু'জন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, হয়তো বা তারা বুঝতে পারলো তাদের এত দিনের সাধনা সব ধূলিসাৎ হয়ে গেলো।

বনহুর ঐ সময় শয়তান লোক দুটিকে আটক করে ফেললো। নিজের গোপন পকেট থেকে ক্ষুদ্র পিস্তলখানা বের করে ওদের বুক লক্ষ্য করে উঁচু করে ধরলো। লোক দু'জন এ-ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিয়ে, একজন পাশের একটা সুইচে চাপ দিতে গেলো কিন্তু তার পূর্বেই লোকটার ডান হাতখানা লক্ষ্য করে বনহুরের ক্ষুদে পিস্তল থেকে গুলী বেরিয়ে এলো।

ঝুলে পড়লো লোকটার ডান হাতখানা।

একটা আর্তনাদ তার মুখ দিয়ে বের হলো।

ঠিক ঐ দন্ডে অপরজন বনহুরকে জাপটে ধরে ভীষণ এক ধাক্কা মারলো।

পড়ে গেলো বনহুর।

অমনি পুনরায় বলিষ্ঠ নরশয়তানটা ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

শুরু হলো ধস্তাধস্তি।

যে নরশয়তানটার হাতে বনহুরের ক্ষুদে পিস্তলের গুলী বিদ্ধ হয়ে ঝুলে পড়েছিলো সে বাম হাতে একটা সুইচ টিপে ধরলো।

অমনি সমস্ত গুহার মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো রাশিকৃত ধূয়া। ওগুলো ঠিক ধূয়ারাশি নয় এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস। বনহুর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার উপক্রম হলো।

সে দু'হাতে মুখ চেপে ধরলো।

তবু টলছে তার পা দু'খানা।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না বনহুর।

এক সময় সম্পূর্ণ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে সে।

তারপর যখন জ্ঞান হলো তখন বনহুর দেখলো তার পাশে কেউ নেই।

বনহুর মাথা উঁচু করে ধরলো, দেখবার চেষ্টা করলো চারপাশে। কতকগুলো মেশিন আর দু'জন লোক পড়ে আছে তার কাছাকাছি।

বনহুরের স্মরণ হলো সব কথা।

রাশিকৃত ধূয়ার মধ্যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো। দু'হাতে নাকমুখ চেপে ধরে নিজকে শক্ত রাখার চেষ্টা করছিলো সে কিন্তু নিজকে রক্ষা করতে পারেনি, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো নিজের অজ্ঞাতে।

বনহুর কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলো সে জানে না। তবে বেশ কিছু সময় যে তার জ্ঞান ছিলো না এ কথা সত্য।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবং পাশে পড়ে থাকা লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখলো সে তখনও জীবিত আছে, অল্পক্ষণেই সংজ্ঞা ফিরে পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এবার বনহুর টেবিলে শায়িত ব্যক্তির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। হাত-পা শক্তভাবে বাঁধা থাকায় নড়াচাড়া করতে পারেনি এবং সে মৃত্যুবরণ করেছে।

বড় করুণ মর্মান্তিক মৃত্যু এটা।

প্রথম ব্যক্তির লাশটা লৌহশিকলে ঝুলন্ত অবস্থায় স্থির হয়ে আছে। পাশেই আরও দু'তিনটে ঝুলন্ত অবস্থায় লাশ রয়েছে। মেশিন বন্ধ থাকায় লাশগুলো কংকাল তৈরি গুহায় প্রবেশ করতে পারেনি।

বনহুর একনজরে সব দেখে নিয়ে জীবিত ব্যক্তিটার পাশে গিয়ে তাকে তুলে নিলো কাঁধে, তারপর সুড়ঙ্গপথ ধরে অগ্রসর হলো।

কিছুটা যেতেই দেখতে পেলো একটা চক্রাকার মেশিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! বনহুর সেই চক্রাকার মেশিনটার পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো সেটা কোনো বিশেষ মেশিনের হ্যাণ্ডেল বা সুইচ।

জায়গাটা সুড়ঙ্গের শেষ অংশ বলা চলে।

বেরিয়ে যাবার আর কোনো পথ নেই।

বনহুর সেই চক্রাকার মেশিনের মাঝামাঝি একটা চাকতিতে চাপ দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর ব্যাপার—মেঝেটা সাঁ সাঁ করে নিচে নেমে যাচ্ছে। যেন একটা লিফট—

বনহুর লোকটার সংজ্ঞাহীন দেহ তখনও কাঁধে রেখেছে। যা ভাগ্যে ঘটে দু'জনেরই ঘটবে। কিন্তু লোকটা তো সংজ্ঞাহীন। লোকটার চেহারা ভালভাবে লক্ষ্য করার সময় নেই, তবু যতটুকু দেখছে তাতে বেশ বুঝতে পারছে লোকটা সাধারণ লোক নন, কোনো যোগ্য ব্যক্তি।

লিফট্ অথবা মেঝেটা থেমে গেলো।

বনহুর অপর এক চাকতি বা সুইচে চাপ দিতেই দরজার মত একটা পাথরখন্ড সরে গেলো একপাশে। সচ্ছ মুক্ত বাতাস সমস্ত শরীরে এবং চোখেমুখে এসে লাগলো।

বনহুর সংজ্ঞাহীন লোকটার দেহ কাঁধে নিয়েই বেরিয়ে এলো বাইরে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন পথ, দু'পাশে গভীর জঙ্গল আর ঝোপঝাড়।

লোকটাকে বহুক্ষণ কাঁধে রাখায় বনহুরের বেশ কষ্ট হচ্ছিলো, তাই সে হাঁপিয়ে পড়েছিলো।

একটা বৃক্ষতলে বনহুর লোকটাকে শুইয়ে দিলো। অত্যন্ত পিপাসা বোধ করছিলো সে, চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো পানি পাওয়ার কোনো আশা নেই সেখানে।

ঠিক্ ঐ সময় সংজ্ঞা ফিরে এলো লোকটার। সে তাড়াতাড়ি লোকটার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লো, ডাকলো—শুনুন, আপনি কি চোখ মেলতে পারছেন না?

লোকটা ধীরে ধীরে চোখ মেললো।

বনহুরকে সে চেনে না জানে না তাই বললো—আপনি কে?

বনহুর বললো—আমি একজন অজানা পথিক। বন্ধু ভাবতে পারেন।

লোকটা ধীরে ধীরে উঠে বসলো, তারপর চারিদ্দিকে তাকিয়ে বললো—আমি এখন কোথায়?

আপনি সেই মৃত্যুভয়াল যমপুরীতে নেই—আপনি নিরাপদ স্থানে রয়েছেন!

হাসলো বনহুর, তারপর বললো—আমার তেমন কোনো পরিচয় নেই তবে আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করতে পারেন।

না, আপনি শুধু হিতাকাঙ্ক্ষীই নন আপনার এমন কোনো পরিচয় আছে যা আপনাকে মহান ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বলুন আপনি কে......

কথা শেষ হয় না লোকটার, চারপাশে ঘিরে ধরে কয়েকজন নরপশুর দল। তাদের হাতে নানা ধরনের অস্ত্র।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

লোকটা তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয় বলে দাঁড়াতে পারলো না। ভয়বিহ্বল চোখে তাকালো লোকগুলোর দিকে, তারপর ফিরে তাকালো বনহুরের মুখে।

বনহুর দু'হাত উঁচু করে দাঁড়ালো। চোখ দুটো তার জ্বলছে যেন।

নরপশুদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি দু'জন রয়েছে যাদের একজনের হাতে গুলী বিদ্ধ করেছিলো বনহুর। লোকটার হাতে ব্যান্ডেজ চোখেমুখে ভীষণ হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে।

ওরা বনহুরকে বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা হত্যা করেছে বলেই মনে করেছিলো এবং সে কারণেই নিশ্চিন্ত হয়ে যখন পুনরায় সেই গুহায় প্রবেশ করে তখন সেখানে টেবিলে শায়িত হাত-পা বাঁধা লোকটাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায় এবং অপর ব্যক্তি ও সেই দুর্ধর্ষ লোকটাকে দেখতে পায় না, তাদের মৃত্যু ঘটলে তারা নিশ্চয়ই সেখানে পড়ে থাকতো। যখন তারা বুঝতে পারে তাদের মৃত্যু ঘটলে তারা নিশ্চয়ই সেখানে পড়ে থাকতো। যখন তারা বুঝতে পারে তাদের মৃত্যু ঘটেনি এবং তারা চলে যেতে সক্ষম হয়েছে তখন তারা দলবল নিয়ে সেই গোপনপথে চলে আসে।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছে যেন ওদের পাকড়াও করতে কষ্ট না হয়।

বনহুর আর ভদ্রলোকটা যখন নিশ্চিন্তভাবে কথাবার্তায় অন্য মনস্ক ছিলো তখন তারা আচম্বিতে ঘিরে ফেলে।

হাত দু'খানা উঁচু করে ধরলেও বনহুর ভিতরে ভিতরে উদ্ধারের উপায় খুঁজছিলো।

ওরা যখন বনহুর আর ভদ্রলোক টাকে আটক করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তখন বনহুর তাদের দলপতি যে সর্বপ্রথম সারিতে দন্ডায়মান ছিলো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রচন্ড ঘুষিতে ধরাশায়ী করে।

শুরু হয় ধস্তাধস্তি।

ওরা গুলী ছোড়ার সুযোগ করতে পারে না, কারণ যদি নেতার শরীরে গুলী বিদ্ধ হয়। তাই তারা গুলী ছোড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে।

বনহুর কৌশলে নেতাকে সম্মুখে রেখে কাজ করছিলো। যেন কোনোক্রমে ওরা গুলী ছুড়তে না পারে। লোকগুলো চারপাশ ঘিরে রেখেছে, একটু ফাঁক পেলেই দলপতির সঙ্গে লড়াইকারীকে ওরা গুলী ছুড়ে হত্যা করবে।

এক সময় সুযোগ বুঝে গুলী ছুড়লো একজন লোক।

ঐ মুহূর্তে বনহুর নিচে পড়ে যায়।

গুলী গিয়ে বিদ্ধ হয় তাদের দল নেতার শরীরে।

দল নেতা বিকট আর্তনাদ করে চীৎ হয়ে পড়ে যায় মেঝেতে।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর ব্যাপার, দলল সবাই নিজ নিজ অস্ত্র গুটিয়ে নিয়ে সুড়ঙ্গপথের দিকে ছুটে পালিয়ে গেলো।

বনহুর অবাক হলো তাদের আচরণে তবে পরক্ষণেই বুঝতে পারলো সর্দার মানে দলপতি হত্যা হওয়ায় ভীত হয়ে সবাই পালিয়ে গেলো।

ভদ্রলোকটি এতক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসেছিলো এক কিনারে এবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে এলেন বনহুরের পাশে।

বনহুর ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে।

পাশে বিকৃত মৃতদল নেতার রক্তাক্ত দেহ!

বনহুর ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করে বললো—চলুন আমরা এস্থান ত্যাগ করি।

উভয়ে পা বাড়ালো।

কিন্তু কোন্ পথে যাবে তারা।

সমস্ত জায়গা জুড়ে শুধু বন আর বন। শুধু বন নয় ঘন আগাছা আর ঝোপঝাড়ে ভর্তি চারিদিক। এমনকি সে জঙ্গলে কোন দিন সূর্যের আলো প্রবেশ করেছে কিনা কে জানে!

বনহুরের জুতোর গোড়ালির মধ্যে লুকানো আছে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা। এই মুহূর্তে ঐ ছোরা তার কাজে লাগলো। জুতোর মধ্য হতে ছোরা খুলে নিয়ে লতাগুল্ম আর হাল্কা জঙ্গল পরিষ্কার করে পথ তৈরি করে নিচ্ছিলো বনহুর।

বেশ কিছুদূর এসে পড়ার পর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে ভদ্রলোকটি। সে আর চলতে পারছে না কিন্তু এ এগুলো তো চলবে না।

বনহুর তাকে সাহায্য করে চললো।

অনেকটা পথ এসে পড়লো তারা। এতক্ষণ দিনের আলো ছিলো এবার সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসছে, যদিও, সূর্যের আলো এ জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারে না তবু সূর্যের আলোক রশ্মির একটা উজ্জ্বল আলো গোটা জঙ্গলটাকে কিছুটা আলোকিত করে রেখে ছিলো, এবার ঘন অন্ধকারে ভরে উঠে চারিদিক।

বনহুর ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করে বলে—যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। গভীর জংগলে নানা রকম হিংস্র জীবজন্তু আছে, কাজেই আমরা নিরাপদ নই...

হাঁ, সে কথা সত্য কিন্তু উপায়? বড় অসহায় করুণ কণ্ঠে বললো লোকটা।

বনহুর বললো—গাছে চড়তে পারেন?

লোকটা ঢোক গিলে বললো—তেমন জানি না। তবে চেষ্টা করলে হয়তো পারবো।

তাহলে চলুন কোনো গাছে চড়ে বসা যাক। কথাটা বলে বনহুর ঝাপসা অন্ধকারে বৃক্ষগুলোর দিকে তাকালো, এমন সময় হঠাৎ তার নজর পড়লো দূরে গহন জঙ্গলের মধ্যে আলো জ্বলছে।

বনহুর বললো—ঐদিকে আলো নজরে পড়ছে, দেখা যাক ওখানে গিয়ে কথাটা বলে বনহুর ভদ্রলোকটার হাত ধরে নিয়ে চললো সেই দিকে।

ক্রমেই জমাট অন্ধকার হয়ে আসছে বনটা। অসংখ্য জীবজন্তুর চিৎকার ভেসে আসছে চারিদিক থেকে। বনহুর আর ভদ্রলোক দ্রুত এগিয়ে চললো সেই আলোর ছটা লক্ষ্য করে।

কোনো পথ নেই, তাই ঘন বন পেরিয়ে চলতে বড় অসুবিধা হচ্ছিলো তাদের। কিন্তু না এগুলে তো আর চলবে না। বনহুর যতদূর সম্ভব ভদ্রলোকটাকে সহায়তা করে চলেছে।

অনেকটা সময় লেগে গেলো। তারা যখন এগুচ্ছিলো তখন ছোটখাটো জীবজন্তুগুলো পদশব্দে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক।

বনহুরের হাতে ক্ষুদে পিস্তলখানা রয়েছে।

হঠাৎ কোনো বিপদ এলে যেন ঐ পিস্তল ব্যবহার করতে পারে। বনহুর নিজের জন্য বেশি চিন্তিত হয়, সে বেশি ভাবছে ভদ্রলোকটার জন্য।

বনহুরের চিন্তা ভদ্রলোকটাকে হারালে তার অনেক কিছু জানার বাকি থেকে যাবে। এতক্ষণে অনেক কিছু জানার ছিলো কিন্তু তখন সুযোগ হয়নি যে নিশ্চিন্তে ভদ্রলোকটার কথা শুনবে। কে এই ভদ্রলোক? কি এর পরিচয়? তার সঙ্গী দুজনই বা কে ছিলো? কি ভাবে তাদেরকে হীরা পর্বতের গভীর তলদেশে আনা হয়েছিলো? এতগুলো প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে আছে ঐ ভদ্রলোকটার মধ্যে। তাই বনহুর ওকে হারাতে চায় না, তা ছাড়াও মানবতাবোধ রয়েছে, অসহায় ব্যক্তিকে সহায়তা করাই বনহুরের ধর্ম।

বনহুর আর লোকটা আলোটার কাছাকাছি এসে পড়তেই তারা দেখলো গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা ভগ্ন প্রাসাদ। তারই একটা কক্ষের গবাক্ষ দিয়ে আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে।

গভীর জঙ্গলে ভগ্ন প্রাসাদ, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ আজ যেখানে নগর, কয়েক যুগ পরে হয়তো সেখানে গভীর জঙ্গল। আজ যেখানে সাগর কয়েক যুগ পরে সেখানে নগর। আজ যেখানে পর্বত কয়েক যুগ পরে সেখানে সাগর—এটা বিস্ময়কর কিছু নয়। প্রকৃতির এটাই নিয়ম। বনহুর একটা আশার আলো দেখতে পায়, মনটা ভরে উঠে খুশিতে।

ভদ্রলোকটাকে লক্ষ্য করে বলে বনহুর—যা হোক রাতের মত একটু ঠাঁই করে নিতে পারবো হয়তো। চলুন আমরা ঐ পোড়োবাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করি।

বনহুররের জীবনে এ ধরনের ঘটনা বহু ঘটেছে।

গভীর জঙ্গলে বনহুর ভগ্ন প্রাসাদের সন্ধান সে পেয়েছে অনেক বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীনও সে হয়েছে।

এ কারণেই বনহুর এই ভগ্ন প্রাসাদ লক্ষ্য করে তেমন কোনো আশ্চর্য বা অবাক হলো না।

ভদ্রলোকটাকে নিয়ে সেই ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলো বনহুর যত সহজভাবে আমরা ভাবছি তত সহজে প্রবেশ করা গেলো না, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে প্রবেশ করলো তারা।

লক্ষ্য তাদের আলোকরশ্মিটা।

ঐ আলোর ছটা লক্ষ্য করে বনহুর আর ভদ্রলোক সেই ভগ্ন প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। ভীষণ জীবজন্তুর ভয় রয়েছে, আর না এগিয়ে উপায় নেই।

আলোর ছটা যে কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছিলো সেই কক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে বনহুর চমকে উঠলো। একটা আলো জ্বলছে, ঠিক লণ্ঠন বা ঐ ধরনের কোনো বাতি। কক্ষের মাঝামাঝি একটা খাট বা চৌকি রয়েছে। তার উপরে শায়িত রয়েছে কোনো ব্যক্তি। তার দেহটা সম্পূর্ণ সাদা কাপড়ে ঢাকা। যেমন করে মৃতদেহ ডেকে রাখা হয় ঠিক ঐভাবে কারও দেহকে ঢেকে রাখা হয়েছে।

বনহুর অন্ধকারে এগুবে, পেছন থেকে ভদ্রলোকটা বাধা দিয়ে চাপাকণ্ঠে বললো—আপনি ঐ কক্ষে যাবেন না।

বনহুর বললো—এতদূর এসে যদি ঐ কক্ষে প্রবেশ না করি তাহলে আমাদের আসাটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারেন।

কথাটা বলে বনহুর সেই শ্বেতবস্ত্রে আবৃত দেহটা যে কক্ষে শায়িত রয়েছে সেই ভগ্ন কক্ষে প্রবেশ করলো।

লণ্ঠনটা দেয়ালে ঝুলছে।

লণ্ঠনের আলোতে কক্ষটা সামান্য আলোকিত হচ্ছিলো। কেমন যেন ভয়াবহ ভাব বিরাজ করছে সেই পোড়াবাড়ির ভগ্ন কক্ষটার মধ্যে। ঝি ঝি পোকার অবিশ্রান্ত ডাক স্থানটাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে।

সেই ভগ্ন কক্ষটার মধ্যে শায়িত সাদা কাপড়ে ঢাকা দেহটার পাশে বনহুর দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় কাপড় সরিয়ে ফেললো! সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো সে। দেখলো এক বিকৃত আকার মৃতদেহ। জিভটা বেরিয়ে আছে প্রায় কয়েক ইঞ্চি, চোখ দুটো উপড়ে তুলে নেওয়া হয়েছে। ললাটের ঠিক মাঝামাঝি একটা লৌহশলাকা বসানো রয়েছে। দাঁতগুলো কেটে বসে আছে জিভটার মাঝমাঝি।

বনহুর ফিরে তাকালো তার সঙ্গীটার দিকে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তার মুখমন্ডল, এমন বীভৎস মৃতদেহ সে কোনোদিন দেখেনি। কি ভয়ংকর মর্মান্তিক দৃশ্য।

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো—কে এই হতভাগ্য ব্যক্তি...

কিন্তু কে দেবে তার জবাব?

সব যেন কেমন রহস্যপূর্ণ।

পোড়ো রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এ যেন এক ভৌতিক ব্যাপার। মৃতদেহের শিয়রে আলো কেন? কে এই আলো জ্বেলে রেখে গেছে? কি তার উদ্দেশ্য? লোকটাকে এভাবে হত্যা করার পর তার দেহ সাদা ধবধবে কাপড়ে ঢেকে রাখার কারণ কি?

সব যেন বিস্ময়কর মনে হচ্ছে।

বনহুর চাদর দিয়ে পুনরায় মৃতদেহটা ঢেকে দিলো, তারপর তাকালো ভগ্ন প্রাসাদের ভগ্ন অংশগুলোর দিকে। ভাবলো এ রহস্যের সমাধান সহজসাধ্য নয় তবু সে চেষ্টা করবে এই রহস্য উদঘাটন করতে।

এমন সময় হঠাৎ কয়েকজন তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো, সবার মুখেই মুখোশ।

বনহুর দ্রুতহস্তে তার সঙ্গী ভদ্রলোকটাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো?

ততক্ষণে ঐ মুখোশধারী দলটির দলনেতা বনহুরের একেবারে কাছে এসে জামার কলার চেপে ধরলো এবং কোনো কথা না বলে বজ্রমুষ্টি বসিয়ে দিলো বনহুরের চোয়ালে।

বনহুর টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। একটা ভাঙা ইটের উপর পড়ে কপালের একপাশে কেটে গেলো খানিকটা।

উঠে দাঁড়ালো সে!

তার ললাট বেয়ে রক্ত গড়িয়ে এলো।

হাতের পিঠে রক্ত মুছে নিলো সে, তারপর কঠিন হাতে চেপে ধরলো মুখোশধারী লোকটার গলা। ভীষণভাবে চাপ দিতেই গোঁ গোঁ করে শব্দ করতে লাগলো লোকটা।

তখন অন্যান্য মুখোশধারী এক সাথে আক্রমণ করলো বনহুরকে।

বনহুর ঘুষির পর ঘুষি চালিয়ে চললো।

সেকি ভীষণ আক্রমণ!

বনহুর প্রাণপণে লড়ছে।

এতগুলো লোকের সঙ্গে পেরে উঠা মুস্কিল, বনহুর তবু সবাইকে পাল্টা আঘাত করে চললো! তার সুন্দর পৌরুষদীপ্ত মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে।

এখনও তার কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে।

রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে বনহুরের মুখখানা।

বনহুরের তাতে এতটুকু গ্রাহ্য নেই, সে বীর বিক্রমে লড়ে চলছে।

বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না তারা, বনহুরের কাছে দলপতির পরাজয় হবার সঙ্গে সঙ্গে মুখোশধারী দল হঠাৎ উধাও হয়ে গেলো।

কে কোন্ পথে সরে পড়লো ভালভাবে বোঝাই গেলো না।

বনহুর দলপতির গলা টিপে ধরলো ভীষণভাবে।

গোঁ গোঁ করে আওয়াজ বেরিয়ে এলো দলপতির মুখ থেকে। বনহুর ওর মুখ থেকে মুখোশখানা টান মেরে খুলে ফেললো। দেখতে পেলো এক জটাজুটধারী লোক। দাড়ি গোফে ভরা মুখ খানা তার। চোখ দুটো দেহের বা মুখের আকারে অতিক্ষুদ্র, বন্য শুকরের মত লাল টক্‌টকে।

বনহুর ওর মুখ থেকে মুখোশ খুলে ছুড়ে ফেলে দিলো দূরে। তারপর আবার এক প্রচন্ড ঘুষি। লোকটার নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়লো। ওষ্ঠদ্বয় কেটে দু'ফাঁক হয়ে গেলো।

তবু সে উঠে দাঁড়ালো।

টলছে লোকটা গরিলার মত।

বনহুর ওর টুটি টিপে ধরে কঠিন কণ্ঠে বললো—কে তুই? আর ঐ মৃতদেহটাই বা কার?

লোকটা হাঁপাচ্ছে রীতিমত, তবু তার ক্রুদ্ধ ভাব কমেনি একটুও। সে বললো—আমাকে তুমি চেনো না? আমি যাদুসম্রাট নিক্কাশো।

বনহুর বললো—তাই নাকি?

হাঁ। আমাকে তুমি কিছুতেই হত্যা করতে পারবে না। আমার জীবন অত্যন্ত কঠিন।

তা দেখা যাবে। তার পূর্বে বলো এই মৃতদেহ কার? এবং তাকে কেন এভাবে শুইয়ে সাদা কাপড়ে ঢেকেছো?

বললো যাদুসম্রাট নিক্কাশো—ওর জীবনটা আমি আমার জীবন রক্ষাভাণ্ডে রেখেছি—শুধু ওর নয়, ঐ রকম অনেক ব্যক্তির জীবন আমি আমার ভাণ্ডে জমা রেখেছি...

বনহুর বললো—জীবন তুমি তোমার ভাণ্ডে রেখেছো!

হাঁ।

যাক, তোমাকে হত্যা না করে তোমার জীবন রক্ষাভাণ্ড আমি দেখতে চাই! তার পূর্বে বলো কে ঐ ব্যক্তি?

সহজভাবেই জবাব দিলো যাদুসম্রাট—হীরা নগরীর শ্যাম যাদুকর।

শ্যাম যাদুকর।

হাঁ, সে বলে বেড়াতো আমি সবচেয়ে বড় যাদুকর।

তাই তুমি তাকে হত্যা করে......

ওর নশ্বর দেহটাকে আমি হত্যা করেছি কিন্তু ওর জীবনটা আমি ধরে রেখেছি।

চমৎকার তোমার ধারণা। আচ্ছা, ওর জীবনটা না হয় তুমি তোমার জীবন রক্ষাকারী ভাণ্ডে রাখলে, কিন্তু চোখ দুটো গেলো কোথায়?

এত আঘাতের পরও লোকটা বীভৎসভাবে হাসলো। হেসে বললো—চোখ দুটোও চক্ষু রক্ষাভাণ্ডে রাখা হয়েছে...

হ্যাঁ, বলো কি যাদুসম্রাট?

হাঁ, তুমি আমাকে অহেতুক কষ্ট না দিলে আমি তোমাকে সব দেখাবো।

সত্যি বলছো যাদুসম্রাট?

হাঁ, আমি মিথ্যা বলি না।

আচ্ছা, যারা মুখোশধারী পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো তারা কারা?

তারা হলো আমার জীবন রক্ষাকারী সহচর!

তবে তোমাকে এমন বিপদে ফেলে পালালো কেন?

তোমার শক্তির পরিচয় পেয়ে তারা মানে মানে সরে পড়েছে।

চমৎকার! আচ্ছা এবার পূর্বের প্রসঙ্গে আসা যাক।

লোকটার ঠোঁট দু'ফাঁক হয়ে যাওয়ায় কিছুটা রক্ত ওর মুখ গহ্বরে প্রবেশ করে ফেনা আকারে বেরিয়ে আসছিলো। থুক করে একরাশ রক্ত আর থুথু ফেলে নিয়ে হাতের পিঠে মুখে নিলো, তারপর বললো—চক্ষুগুলো যত্ন করে ভাণ্ডে রেখেছি......

তাহলে কি চোখগুলো লোকটার জীবন্ত অবস্থায় তুলে নেওয়া হয়েছে?

হাঁ, নইলে কাজ হবে না।

এত হৃদয়হীন তুমি?

আমি যে সাধনা করে চলেছি তাতে এ করা ছাড়া উপায় ছিলো না।

তাহলে কি তার জীবন্ত অবস্থায় ঐ কপালে লৌহশলাকা—

হাঁ, ঐ লৌহশলাকা তার জীবন্ত অবস্থায় কপালের মাঝখানে পুঁতে দিয়েছি এবং তখনই তার জীবটা ধরে নিয়ে আমার জীবন রক্ষাভাণ্ডে রেখেছি—

খুব ভাল করেছো। চলো তোমার জীবন রক্ষাভাণ্ড এবং চক্ষু রক্ষাভাণ্ড আমাকে দেখাও।

চলো, কিন্তু ঐ কক্ষে তোমার কোনো কথা বলা হবে না।

কারণ?

কোনো আওয়াজ পেলে ভাণ্ডের জীবনগুলো ছট্ ফট্ করবে!

ও তাহলে জীবনগুলো অত্যন্ত সতর্ক এ ব্যাপারে। আচ্ছা যাদুসম্রাট, এতদিনে কতগুলো জীবন তুমি তোমার জীবন রক্ষা ভাণ্ডে রক্ষণ করেছো?

দু'শ' দশজন।

আর চক্ষু?

দু'শ দশজনের চারশ' বিশটা চক্ষু আমার চক্ষু রক্ষাকারী ভাণ্ডে আছে...

ভারীসুন্দর কথা! তোমাকে প্রাণভরে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। আচ্ছা বলো দেখি এই জীবনগুলো এবং চক্ষুগুলো দিয়ে তুমি কোনো সাধনা সাধন করবে?

সংগ্রহ কাজ শেষ হলে আমি মোম আর মাটি মিশ্রণ করে দেহ তৈরি করে তাতে জীবন দান করবো এবং চোখগুলো তখন সেইসব দেহে সংযোগ করবো।

যাদুসম্রাটের কথাগুলো বনহুরকে শুধু বিস্মিতই করলো না। একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছে দস্যুসম্রাট।

যাদুসম্রাটের কথায় তার ধমনির রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো। এই মুহূর্তে ইচ্ছা হলো ওর গলা টিপে হত্যা করে। কিন্তু আরও দেখা এবং জানার বাকি আছে।

মনোভাব গোপন করে বললো বনহুর—যাদুসম্রাট, তোমার সৃষ্টিচিন্তা বড় সুন্দর। রক্তমাংসে গড়া দেহের জীবন এবং চক্ষু নিয়ে মোম আর মাটি মিশ্রণে তৈরী দেহে প্রাণের সঞ্চার অতীব সুন্দর। চলো দেখা যাক তোমার সেই জীবন রক্ষা ভাণ্ড আর চক্ষু রক্ষা ভাণ্ড কোথায়? এই পোড়ো রাজপ্রাসাদের কোন্ স্থানে সেই বিস্ময়কর জিনিসগুলো রক্ষিত আছে। মনে রেখো, কোনো রকম শয়তানি করলে তোমাকে এই পিস্তল দ্বারা হত্যা করবো। তোমার সাধনা বানচাল হয়ে যাবে।

বললো লোকটা—চলো আমার সঙ্গে।

বললো বনহুর—আচ্ছা, এই মৃতদেহটাকে ওভাবে ঢেকে রেখে তার শিয়রে আলো জ্বেলে রেখেছো কেন তা তো বললে না?

ওঃ সেই কথা। আমি যার জীবন গ্রহণ করি তাকে যত্ন সহকারে রক্ষিত করি। দু'সপ্তাহ তাকে এইভাবে সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখি এবং সর্বক্ষণ শিয়রে আলো জ্বেলে রাখি, তারপর দু'সপ্তাহ কেটে গেলে তাকে দেহরক্ষী গুদামে রেখে দেই।

বনহুর এতক্ষণে সব বুঝে নিলো। রাগে ফুলছে তার দেহটা। এই মুহূর্তে ওকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করছে তার। তবু সংযতভাবে বললো—চলো এবার তোমার সেই জীবন রক্ষাভাণ্ডার দেখতে চাই।

চলো।

যাদু সম্রাট এগুলো।

এতক্ষণ সেই ভদ্রলোকটা নিশ্চুপ সবকিছু শুনে যাচ্ছিলো। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিলো। চোখের সম্মুখে তার বীভৎস মৃতদেহ। কয়েক ঘন্টা পূর্বে যে ভয়ংকর মৃত্যুর মুখ থেকে রেহাই পেয়েছে তাও সে ভুলতে পারেনি। কি নির্মম ভয়াল সে মৃত্যু। সঙ্গীদের একজনের দেহ থেকে তাঁর চোখের সম্মুখে রক্ত শুষে নেওয়া হলো, বিবর্ণ ফ্যাকাশে রক্তহীন দেহটা ক্রমে নিস্তেজ হলো, তারপর চিরদিনের মত চক্ষুদ্বয় মুদে গেলো তার। তারপর মৃতদেহটার গলায় লৌহশিকল আটকিয়ে তাকে শূন্যে তুলে নেওয়া হলো। তারপর তাজা প্রাণহীন দেহগুলো কঙ্কালে পরিণত করা হচ্ছে....

ভদ্রলোকের ভয়বিহ্বল মুখমন্ডল লক্ষ্য করে বললো বনহুর—আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

ভদ্রলোক দ্বিধাভরা কণ্ঠে বললো—আপনি যান, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

বুঝতে পারলো বনহুর ভদ্রলোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে, তাই সে তাকে অনুসরণ করতে চাইছে না। বনহুর বললো—আপনার এখানে একা থাকা ঠিক হবে না বলে আমি মনে করছি।

না, আমি এখানেই থাকবো। কোথাও যাবো না। বুকটা আমার কেমন ধকধক করছে।

কিন্তু এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। বললো বনহুর।

এবার ভদ্রলোকটা বনহুরের সঙ্গে যেতে সম্মত হলো।

যাদুসম্রাট এগুচ্ছে।

বনহুর আর ভদ্রলোক এগুচ্ছে তার পিছু পিছু। ভাঙা পাথর আর জঙ্গল ডিংগিয়ে একটা সুড়ঙ্গমুখে এসে দাঁড়ালো যাদুসম্রাট।

বনহুর মাঝে মাঝে ভদ্রলোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো। রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখখানা তার, বড় মায়া হচ্ছিলো বনহুরের। লোকটা ভয় পাচ্ছে জীবনটা তাকে না হারাতে হয়।

সুড়ঙ্গমুখে এসে দাঁড়াতেই শিউরে উঠলো ভদ্রলোক।

অবশ্য বনহুরের মনেও যে একটা আতঙ্ক ভাব সৃষ্টি হচ্ছিলো না তা নয়। না জানি ঐ পোড়োবাড়ির মাটির তলায় কোন্ ভয়ংকর রহস্য লুকিয়ে আছে...

যাদুকর বললো—কি ভাবছো তোমরা, এসো আমার সঙ্গে।

বনহুরই সর্বপ্রথম সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো।

পেছনে ভদ্রলোকটা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো। সে সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন।

বনহুর তবু এগুলো।

প্রথম এগিয়ে যাচ্ছে যাদুসম্রাট।

সুড়ঙ্গপথ গভীর মাটির তলদিয়ে নেমে গেছে।

অনেকটা সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করে বনহুর আর যাদুসম্রাট এসে দাঁড়ালো একটা ভূগর্ভ কক্ষে। এমন ভগ্ন অট্টলিকার গহ্বরে এমন ভয়াবহ স্থান থাকা কোনো আশ্চর্যজনক নয়, তবু বেশ বিস্ময় লাগছে।

যে কক্ষে বনহুর আর যাদুকর এসে দাঁড়ালো, সেই কক্ষে গাঢ় জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলো।

যাদুকর শব্দ করলো—রি-রি-রি—সেকি ভীষণ চিৎকার। প্রতিধ্বনি হতে থাকে সেই ভূগর্ভ কক্ষে। কেমন যেন এক ভয়াবহ শব্দ।

অন্ধকার।

জমাট অন্ধকার।

একটা লালচে আলোর ছটা কিঞ্চিৎ আলোকিত করলো কক্ষটা।

সেই আলোকরশ্মিতে বনহুর স্পষ্ট দেখলো জমকালো মূর্তির মত কতকগুলো ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর বুঝতে পারলো ছায়ামূর্তিগুলো অন্যকিছু নয়, যাদুসম্রাটের দলবল বা সঙ্গী। অন্ধকারেও তাদের মুখে মুখোশ আছে বেশ বোঝা যাচ্ছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পিস্তল উদ্যত করে ধরে বললো—খবরদার, কোনো রকম চালাকি করতে চেওনা, তাহলে তুমি প্রাণ হারাবে।

বনহুরের কথা শুনে অট্টহাসি হেসে উঠলো যাদুসম্রাট বললো—যাদু গুহায় তুমি প্রবেশ করেছো মহাবীর। এবার তোমার কোনো শক্তি কাজ করবে না। তোমার জীবনটাও আমি আমার জীবন রক্ষাকারী ভাণ্ডে সংরক্ষণ করবো।

বনহুর লক্ষ্য করলো, তার চার-পাশে লালচে আলো ছড়িয়ে পড়েছে এবং ছায়ামূর্তিগুলো তাকে ঘিরে ধরেছে।

সেই দন্ডে বনহুর পিস্তল থেকে গুলী ছুড়লো যাদুসম্রাটের বুক লক্ষ্য করে।

কিন্তু কি আশ্চর্য যাদুসম্রাট তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। একটুও নড়লো না তার দেহটা। চারপাশ থেকে বিকট-হাস্যধ্বনি ভেসে উঠলো।

সেই হাস্যধ্বনির প্রতিধ্বনি এক ভয়ংকর শব্দ সৃষ্টি করলো। বনহুরের কানে যেন তালা লাগার উপক্রম হলো। বনহুর তার ক্ষুদে পিস্তল থেকে পর পর গুলী ছুড়তে লাগলো।

এতটুকু কাবু হলো না যাদুসম্রাট।

তার দেহে গুলী বিদ্ধ হয়ে গুলীগুলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। চারপাশ বেষ্টনি ভেদ করা সহজ নয় যদিও তবু বনহুর অপর দিকে গুলী ছুড়লো।

বিস্ময়কর ব্যাপার গুলীগুলো কারও দেহে বিদ্ধ হচ্ছে না। সবাই অট্টহাসি হাসছে বিকট শব্দে।

বনহুর সুড়ঙ্গপথের দিকে এগুলো।

কিন্তু পথ কোথায় সব বন্ধ। জমাট অন্ধকারে—লালচে আলো স্থানটাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে যেন। বনহুর পথ খুঁজে পেলো না। ধীরে ধীরে লালচে আলো মিশে গেলো।

অট্টহাসি থেমে গেলো!

যাদুসম্রাট মিশে গেলো লালচে আলো মুছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। বনহুর বুঝতে পারলো যাদুসম্রাট তার দলবল সহ সরে পড়লো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। কেমন যেন মাথাটা তার টলছে।

দু'চোখ তার মুদে আসছে।

এক অনাবিল শান্তি যেন তাকে চিরতরে টেনে নিচ্ছে। তার হাত থেকে খসে পড়লো পিস্তলখানা। বনহুর শক্ত করে চেপে ধরেও রাখতে পারলো না। কোনো যাদুর পরশে অবশ হয়ে এলো সমস্ত দেহটা।

বনহুর বসে পড়লো সে মেঝেতে।

একি হলো? তবে কি শেষ পর্যন্ত তাকেও যাদুসম্রাটের শিকার হতে হলো...

তারপর আর কিছু স্মরণ নেই বনহুরের।

❑

বনহুর চোখ মেলে চাইলো। স্মরণ করতে চেষ্টা করলো সে কোথায় শুয়ে আছে। কিছু স্মরণে আসছে না। আবার সে চোখ বন্ধ করলো। বুঝতে চেষ্টা করলো কিন্তু কিছু স্মরণে আসছে না।

দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে মাথার চুলগুলো টানতে লাগলো।

এমন সময় একটা শান্ত মিষ্টি কণ্ঠস্বর।

চমকে উঠলো বনহুর—কে?

আমি আশা!

তুমি!

হাঁ।

আমি এখন কোথায়?

হীরা নগরীর কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে।

তুমি এলে কি করে?

সব পরে জানতে পারবে, এখন চোখ বন্ধ করে ঘুমাও বনহুর।

আশা!

বলো?

আমি ঘুমাতে পারবো না যতক্ষণ তুমি আমাকে সব কথা খুলে না বলো।

বলবো। না বলে কি পারি?

বনহুর বেশিক্ষণ চোখ মেলে থাকতে পারছিলো না, কেমন যেন আপনা আপনি চোখ বন্ধ হয়ে আসছিলো তার।

আশা ব্যাকুল দৃষ্টি নিয়ে বসেছিলো তার শিয়রে। বড় ইচ্ছা হচ্ছিলো ওর চুলে হাত বুলিয়ে দেয় কিন্তু সে সাহস যেন আশা হারিয়ে ফেলেছিলো। বনহুরকে স্পর্শ করার মত তার মনোবল ছিলো না, কারণ সে জানে বনহুর তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। আশা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর পুনরায় চোখ মেলে তাকালো, শান্তকণ্ঠে বললো—আশা, আমি এখানে কেন? আর কিইবা হয়েছিলো আমার?

সব ভুলে গেছো বনহুর?

কিছু স্মরণ করতে পারছি না। আশা আমি কি এখন তোমার কুটিরে?

না।

তবে কোথায়?

অজানা এক স্থানে, কোনো এক গুহায়।

এখানে কি করে এলাম?

বলেছি পরে সব বলবো। আশা শিয়র থেকে উঠে গুহামুখে গিয়ে দাঁড়ালো। বনহুর দেখলো আশার শরীরে পুরুষের ড্রেস। পিঠে রাইফেল বাঁধা, পায়ে ভারী বুট। মাথার চুলগুলো খাটো করে বাঁধা, ঠিক বাবরি চুলের মত লাগছে।

বনহুর বললো—আশা, আমি উঠতে পারছি না কেন?

বলেছি তো সব বলবো।

না, তুমি সব বলো? বলো আশা, আমি কি করে এখানে এলাম বা তোমার সান্নিধ্য পেলাম?

এগিয়ে এলো আশা বনহুরের পাশে। পিঠের সঙ্গে বাঁধা রাইফেলটা খুলে হেলান দিয়ে রাখলো গুহার দেয়ালে।

এবার আশা বনহুরের সম্মুখে বসলো, এতক্ষণ সে বনহুরের শিয়রে ছিলো।

বনহুর বললো—আশা!

আশা বললো—বলো।

আমি কি করে এখানে এলাম?

আগে স্মরণ করো তুমি কোথায় ছিলে?

কিছু মনে পড়ছে না। কিছু স্মরণ করতে পারছি না।

সেই এক ভয়ঙ্কর পোড়োবাড়ি...এক যাদুকর নামে নরপশু মনে পড়ে সব কথা?

কই না!

সেই জীবননাশকারী গুহা...যাদুকর আর তার সঙ্গীরা...তোমাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র...মনে পড়ে?

হাঁ, এবার মনে পড়েছে...গভীর জঙ্গলে...সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো বন্য জীবজন্তুর চিৎকার...দূরে আলোর ছটা...এগুলাম সেই দিকে...একটা রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ...পোড়োবাড়ি...ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা বীভৎস মৃতদেহ—হাঁ, সব কিছু স্মরণ হচ্ছে—যাদুসম্রাট—কিন্তু আমি তো একা ছিলাম না? আমার সঙ্গে এক অসহায় ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি, তিনি কোথায় আশা? বনহুর উঠে বসতে গেলো।

আশা ওকে ধরে আবার শুইয়ে দিয়ে বললো—উঠতে চেষ্টা করো না বনহুর, আবার তুমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। এবার সংজ্ঞা হারালে আর কোনোদিন তুমি সংজ্ঞা ফিরে পাবে না। তুমি পাগল হয়ে যাবে বনহুর—

বনহুর আবার শুয়ে পড়লো, আশার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে রইলো।

আশা বলে চলেছে—যাকে তুমি যাদুসম্রাট বলছো সে এক নরশয়তান, তবে যাদুকরও বটে। ওই নরপশু বহুলোককে হত্যা করেছে এবং তার জীবন নিয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। ওর সাধনা, ও মোম আর মাটির পুতুল বানিয়ে তাতে জীবন দান করবে। শুধু এই কারণে সে বহু জীবননাশ করেছে। ঐ নরশয়তান যাদুকরের সঙ্গী বা দলবল প্রায় দু'শ। তারা শহরে-বন্দরে-গ্রামে আত্মগোপন করে লোক সংগ্রহ করে আনে এবং তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বনহুর, আমি এই নরশয়তান যাদুকরকে বহুদিন যাবৎ খুঁজে ফিরছিলাম। আমি জানতে পেরেছিলাম তার সবকিছু...শুধু জানতে পারিনি তার ঠিকানা।

বলো, বলো আশা তারপর? ব্যাকুল কণ্ঠে বললো বনহুর।

তারপর চলেছিলো তার সন্ধান করা। আমিই শুধু নই, জাভেদকেও আমি নিক্কাশোর সন্ধানে নিয়োগ করেছিলাম। তার সঙ্গে ছিলো আমার দু'জন বিশ্বাসী অনুচর। কিন্তু...কিন্তু কিছুতেই তার সন্ধান পাইনি। হঠাৎ

আমার এক সহচর খোঁজ দিলো যাদুকর নিক্কাশোর আস্তানার পথ সে জেনে নিয়েছে। আমি তার কাছে পথের সন্ধান নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম। আশা আমার পূর্ণ হয়েছে। শুধু যাদুকর নর-শয়তানটাকেই আমি কাবু করতে সক্ষম হইনি, তার সমস্ত যাদুর গুহা ডিনামাইট দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছি। ধ্বংস করবার পূর্বে তোমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঐ ভূগর্ভে একটা কক্ষের মেঝেতে পাই। বনহুর, তোমাকে না পেলে বা ঐ সময় না দেখলে হয়তো বা যাদুকরের যাদুগুহা ধ্বংসের সঙ্গে তুমিও..না না, ভাবতে পারি না সে কথা। বনহুর, তোমাকে দেখতে পেয়েছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য, দয়াময়ের পরম করুণা।

বনহুর বললো—কি হবে আর বেঁচে। জীবনটা আমার নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আশা...

এ তুমি কি বলছো বনহুর!

হাঁ, যা সত্যি তাই বলছি। আশা, তুমি যদি ঐ মুহূর্তে আমাকে যাদুগুহা থেকে উদ্ধার করে না আনতে তাহলে আমি বেশি খুশি হতাম।

বনহুর!

তুমি জানো না আশা, আমি চিরদিন সবাইকে কাঁদিয়েই এলাম, কাউকে আনন্দ দিতে পারিনি। বড় অভিশপ্ত জীবন আমার।

বনহুর, তুমি সবার সাধনা কামনার জন্য...

না না আশা, না! আমার জন্য মাকে অহরহ চোখের পানি ফেলতে হয়...আমার জন্য মনিরার মনে শান্তি নেই কান্না তার সাথী...নূরীর সুন্দর ছন্দময় জীবনটা আমারই জন্য গতিহীন হয়ে পড়েছে...নূর মস্তবড় গোয়েন্দা, মস্তবড় ডিটেকটিভ হয়ে ফিরে এসেছে। আজ সে গৌরবের বস্তু কিন্তু আমি তাকে বরণ করে নিতে পারিনি...নূর তার পিতার জন্য ব্যাকুল, পিতার স্নেহ-ভালবাসার কাঙ্গাল সে, অথচ আমি তার পিতা হয়ে...আশা, আশা আমার জন্য এ কম দুঃখ নয়...

আশা প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য অন্য কথায় এলো, বললো সে—একটা সুসংবাদ আছে তোমার জন্য যা এখনও তোমাকে বলা হয় নি।

আমার জীবনে সবই সুসংবাদ আশা। দুঃসংবাদ বলে আমার কিছু নেই, কারণ আমি সবকিছু মেনে নিতে প্রস্তুত আছি।

তবে এ সংবাদ তোমাকে প্রচুর আনন্দ দেবে তা আমি জানি...

তাহলে বলো কি এমন কথা?

অবশ্য তার জন্য ধন্যবাদের পাত্র হলো তোমার বড় আদরের ধন জাভেদ। কথাটা বলে উঠে দাঁড়ালো আশা।

বনহুর উঠতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না, তার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো।

আশা পুনরায় তার পাশে বসে পড়ে বললো—তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ নও! যাদুকর নিক্কাশো তোমাকে চিরদিনের জন্য স্তব্দ করে দেবার জন্য এক ভয়াবহ বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে সংজ্ঞালুপ্ত করে দিয়েছিলো। কোনোদিন তুমি আর সংজ্ঞা ফিরে পেতে না...

তাহলে আমি কি করে সংজ্ঞা ফিরে পেলাম আশা?

দীর্ঘ সময় তোমাকে এক সন্ন্যাসীর দ্বারা চিকিৎসা করানোর পর তুমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছো এবং স্বাভাবিক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছো।

আশা!

হাঁ বনহুর।

জানি তোমার প্রাণঢালা চেষ্টাতেই আমি নবজীবন লাভ করতে পেরেছি।

এমন সময় গুহামুখে একটা শব্দ হলো।

আশা উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আসুন সন্ন্যাসী বাবাজী।

বনহুর দেখলো গুহায় প্রবেশ করলেন এবং সন্ন্যাসী। সুদীর্ঘ দেহ, মাথায় রাশিকৃত জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ললাটে চন্দনের টিপ। পরনে বাঘের চামড়া, হাতে লোহার চিম্‌টা। চোখ দুটো জ্যোতির্ময়।

সন্ন্যাসী গুহায় প্রবেশ করতেই আশা নতজানু হয়ে সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করলো।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করলেন—মনস্কামনা পূর্ণ হোক মা। আজ কেমন আছে তোমার রোগী?

হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো আশা—আজ ওর সংজ্ঞা ফিরে এসেছে... সুস্থভাবে কথা বলছে...আমাকে চিনতে পেরেছে।

সন্ন্যাসী বাবাজীর মুখে আনন্দভরা ভাব ফুটে উঠলো। তিনি বনহুরের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন, তারপর ওর একটা হাত হাতের মুঠায় তুলে নিয়ে বললেন—আমি জানতাম আমার ওষুধ বিফলে যাবে না এবং সেই বিশ্বাস নিয়েই আমি আজ এখানে এসেছি।

বললো আশা—সন্ন্যাসী বাবাজী, আপনি বলুন কি চান? যা চাইবেন তাই দেবো আমি ওর জীবনের বিনিময়ে।

সন্ন্যাসী বাবাজী উঠে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক শব্দ করলেন, তারপর তিনি বললেন—পৃথিবীর কোনো বস্তুর উপর আমার লোভ-লালসা-মোহ নেই, কাজেই তুমি কি দেবে মা আমাকে?

আপনাকে দেবার মত আমার তাহলে কিছুই নেই।

তাহলে আমি তোমাকে দেই? আমার আশীর্বাদ রইলো তোমার জন্য কেউ কোনো দিন তোমাকে পরাজিত করতে পারবে না কথাগুলো উচ্চারণ করবার পূর্বে সন্ন্যাসী বাবাজী আশার মাথায় হাত রাখলেন।

আশার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দুফোঁটা অশ্রু।

সন্ন্যাসী বাবাজী বনহুরের দিকে লক্ষ্য করলেন, তারপর ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন সেই গুহা থেকে।

আশা গুহার মুখ পর্যন্ত এগিয়ে গেলো।

তারপর ফিরে এলো সে বনহুরের পাশে।

বললো বনহুর—বড় আশ্চর্য এই জ্যোতির্ময় দেবপুরুষ।

আশা বললো—ঈশ্বরের আশীর্বাদ আর এ দেব পুরুষের শক্তিময় ওষুধ তোমার জ্ঞান ফিরে আনায় সহায়তা করেছে।

সেজন্য তুমিই ধন্যবাদের অধিকারিণী আশা! জানি না কেন, তুমি বারবার নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করছো? কেন...বলো কেন তুমি আমাকে

আমি তোমাকে ভালবাসি তাই...

কিন্তু আমি তো তোমাকে তার বিনিময়ে......

আশা বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়—থাক্ সে কথা। যা বলতে চেয়েছিলাম সেই শুভ সংবাদটা কিন্তু এখনও তোমাকে দেওয়া হয়নি।

বলো কি সে শুভ সংবাদ?

যে তাজের জন্য তুমি হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছিলে তোমার সেই প্রিয় তাজকে উদ্ধার করে এনেছে তোমার প্রিয় পুত্র জাভেদ।

তাজ! তাজ ফিরে এসেছে? তাজকে খুঁজে পাওয়া গেছে তাহলে?

হাঁ।

কোথায় আমার তাজ?

এখন উঠতে চেষ্টা করো না, একটু সুস্থ হলেই দেখতে পাবে তোমার তাজ গুহার বাইরে অপেক্ষা করছে।

আমার তাজ ফিরে এসেছে সত্যি আশা, এটা আমার সবচেয়ে শুভ সংবাদ। বনহুর আনন্দে আত্মহারা হয়ে আশার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরলো।

আশার সমস্ত শরীরে এক অপূর্ব অনুভূতি নাড়া দিয়ে গেলো। বুকটা ওর টিপ্ টিপ্ করছে। নির্জন গুহায় বনহুরের সান্নিধ্য আশার হৃদয়ে আনলো আনন্দে শিহরণ।

কিন্তু বেশিক্ষণ বনহুরের হাতের মুঠায় আশা নিজের হাতখানা রাখতে পারলো না, কারণ আশা জানে নারীর কাছে পুরুষের পরাজয় ঘটতে পারে আর সে জন্য দায়ী নারীই হবে। তাই আশা তাড়াতাড়ি নিজের হাতখানাকে সরিয়ে নিলে বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের মুঠা থেকে।

সে কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে গেলো গুহা থেকে।

বনহুর পাশ ফিরে শুলো, তার মুখমন্ডলে উচ্ছল আনন্দ ভাব, কারণ তাজকে হারিয়ে বনহুর নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলো। তাজ তার জীবনের চেয়ে প্রিয়। কতদিন সে তাজকে দেখেনি, কতদিন সে তাজের পিঠে চড়েনি, একটা দারুণ হাহাকারে ভরে ছিলো তার হৃদয়। তাজ ফিরে এসেছে—এ আনন্দ, এ খুশি যেন সে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না।

জীবনটা যেন তার বড় সুন্দর ছন্দময় মনে হচ্ছে। তাজের সান্নিধ্য পাবার জন্য বনহুর ব্যাকুল হয়ে উঠলো। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, পা দু'খানা তার টলছে মাতালের মত। কোনো রকমে গুহামুখে এসে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে অদূরে তাজের উপর তার নজর গিয়ে পড়লো। আশা তাজের পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো।

বনহুর গুহার দেয়াল ছেড়ে দিয়ে যেমনি পা বাড়ালো, অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো গুহার দরজায়।

আশা দৌড়ে এসে তাকে তুলে ধরলো, বললো— কেন তুমি বেরিয়ে আসতে গেলে বনহুর? সন্ন্যাসী বাবাজী বলেছেন দীর্ঘ একমাস তোমাকে শয্যায় শুয়ে থাকতে হবে। নইলে যে কোনো মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারো এবং সে জ্ঞান আর ফিরে আসবে না...

না না, দীর্ঘ একমাস আমি শয্যায় শুয়ে থাকতে পারবো না। আমাকে তুমি শুয়ে থাকতে বলোনা আশা।

কিন্তু এ ছাড়া যে উপায় নেই। চলো তোমাকে আমি শয্যায় শুইয়ে দেই।

আশা, তুমি আমার জন্য আর কত করবে?

যতদিন সম্পূর্ণ সুস্থ না হও ততদিন আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো।

আশার সাহায্যে বনহুর ফিরে এলো শয্যায়।

শয্যায় বসে বললো বনহুর—আশা, তুমি এই নির্জন গুহায় কোমল শয্যা পেলে কোথায়?

এ গুহায় যা দেখছো সব তোমার সন্তান জাভেদের সংগ্রহ। সে তোমার জন্য অনেক করেছে, যে সন্ন্যাসী বাবাজীর ওষুধে তুমি সংজ্ঞালাভ করেছো সেই সন্ন্যাসী বাবাজীকেও খুঁজে এনেছিলো জাভেদ। আজও সে তোমার পথ্যাপথ্য আনার জন্য শহরে গেছে।

জাভেদ জানে আমি এখানে আছি?

হাঁ, সে সব জানে! দু'একদিন নয়, দীর্ঘ পনেরো দিন তুমি এ গুহায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলে।

এ কথা সত্যি আশা?

হাঁ বনহুর, সত্যি।

তাহলে তুমি এতদিন ধরে আমার সেবা-শুশ্রুষা করে চলেছো?

আশা কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকালো।

বনহুর বুঝতে পারলো আশা সমস্ত অন্তর দিয়ে তার সেবাযত্ন করেছে, নাহলে মৃত্যু তার অনিবার্য ছিলো। আজও সে প্রাণঢালা সেবা করে চলেছে।

বনহুরের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠে। সত্যি আশার কাছে সে চিরঋণী। একবার দু'বার নয়, কয়েকবার তার জীবন রক্ষা করেছে......

বললো আশা—কি ভাবছো বনহুর?

ভাবছি তোমার কাছে আমি চিরঋণী......

নিজের জীবনের বিনিময়েও আমি তোমার জীবন রক্ষা করতে চাই। বনহুর, এ আমার জীবনের ব্রত....

কিন্তু কেন তুমি আমার জন্য এত করো বলো, বলো আশা?

জানি না!

আশা!

হাঁ, আমি নিজেই জানি না কেন তোমার জন্য আমার এ ব্রত, এ সাধনা আর তুমি এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করো না বনহুর।

আশা, তুমি যা চাইবে আমি দেবো। প্রেম ভালবাসা...

বনহুর, তুমি যা দিয়েছো সেই তো আমার অনেক, তোমার সন্তান জাভেদকে তুমি দিয়েছো। সে আমাকে আম্মু বলে ডাকে, এটাই আমার বড় পাওয়া। বোন নূরী স্বার্থত্যাগ করে তার নয়নের মনিকে তুলে দিয়েছে আমার হাতে শুধু তোমার বিনিময়ে। আমি যেন তোমাকে না চাই। না না, আর আমার কোনো মোহ নেই বনহুর। শুধু তুমি আমাকে স্মরণ রেখো, তাহলেই আমি মনে করবো তাই আমার চরম পাওয়া। এবার ঘুমাও বনহুর। তুমি গুরুতর আঘাত পেয়েছো।

তুমি তাহলে আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?

না।

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও আশা।

কিন্তু তোমাকে স্পর্শ করার সাহস আমার হয় না।

তাহলে এতদিন কি করে তুমি আমার সেবাযত্ন করেছো আশা?

সংজ্ঞাহারা ব্যক্তিকে সেবাযত্ন করতে দ্বিধা নেই কারও। কারণ সে রোগী আর যে সেবা করে তার মনোভাবও থাকে সেবিকা হিসেবে, তাই তখন তোমার সেবা আমি করেছি....

তুমি যে বললে আরও এক মাস আমাকে শয্যায় শুয়ে থাকতে হবে তাহলে তুমি ছাড়া কে আমার সেবাযত্ন করবে বলো?

আমি ভাবছি তোমাকে এবার পৌঁছে দেবো তোমার আস্তানায়। পারবে? পারবে আমাকে আমার আস্তানা কান্দাইয়ে পৌঁছে দিতে?

নিশ্চয়ই পারবো; আর পারবো বলেই তো আমি তোমাকে কথাটা বললাম।

আশা, সত্যি তুমি দেবী!

বনহুর!

এমন অনেক নারীর সান্নিধ্য আমি লাভ করেছি যারা চেয়েছে প্রেম-ভালবাসা আরও অনেক কিছু কিন্তু তোমার মত পবিত্র মনের সন্ধান আমি পাইনি তাদের মধ্যে। আশা তুমি...

আর বেশি বলো না বনহুর! আশা বনহুরের ঠোঁটের উপর হাত রাখে।

বনহুর পাশ ফিরে শোয়।

আশা পায়চারী করে চলে!

তার ভারী বুটের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তোলে। আশা ভেবে চলেছে...বনহুরের কাজ সমাধা হয়েছে, সে হীরা নগরীতে এসেছিলো হীরার প্রেসিডেন্ট কন্যা মিস মিনারা মির্জার উদ্ধার ব্যাপারে। মিস মিনারা মির্জাকে উদ্ধার করা হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ভয়ঙ্কর একটা দল যারা গোপনে জীবন্ত মানুষকে কঙ্কালে পরিণত করতো সেই দলটাকে ধ্বংস করেছে বনহুর। ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে তাদের নরকঙ্কাল তৈরি কারখানা। হীরা নগরীর কাজ শেষ হয়েছে বনহুরের।

বনহুরের সাফল্যে আশার মন খুশিতে ভরে গেছে অনাবিল শান্তি লাভ করেছে আশা, বনহুরের সফলতাই যে তার জীবনের কাম্য।

❑

পূর্বাকাশে সূর্য উঁকি দেবার অনেক পূর্বেই আশা বনহুরকে নিয়ে পৌঁছে গেলো কান্দাই জঙ্গলে বনহুরের আস্তানায়।

আস্তানার প্রহরীরা সজাগ হয়ে উঠলো।

আধো অন্ধকারে ফাঁকা আওয়াজ করলো তারা একবার দু'বার, তিন বার; বিপদ সংকেত ধ্বনি এটা।

সঙ্গে সঙ্গে আস্তানার সবাই জেগে উঠলো।

রহমান দলবল নিয়ে বেরিয়ে এলো, সবার হাতেই অস্ত্র।

বেরিয়ে এলো নূরী আর নাসরিন।

ততক্ষণে অশ্ব নিয়ে আশা আর বনহুর একেবারে আস্তানার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

জঙ্গলের মধ্যে একেই সূর্যের আলো প্রবেশ করে না, তারপর ভোররাত। অন্ধকার জমাট বলা চলে।

দু'জন অনুচররের হাতে মশাল ছিলো।

তারা মশাল নিয়ে একপাশে থাকায় তেমন বোঝা যাচ্ছিলো না। কায়েস অনুচরদ্বয়ের একজনের হাত থেকে জ্বলন্ত মশালটা নিয়ে এগিয়ে আসতেই আনন্দধ্বনি করে উঠলো—সর্দার...

নূরী ছুটে গেলো। বনহুরকে দেখতে পেয়ে আনন্দে জাপটে ধরলো তাকে—হুর, তুমি এসেছো...কিন্তু একি, কি হয়েছে তোমার...পাশে দৃষ্টি পড়তে অপর-একজনকে দেখে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—কে তুমি?

আশার দেহে পুরুষের ড্রেস থাকায় তাকে সহসা কেউ চিনতে পারলো না। কেউ তাকে চিনবার পূর্বেই তার নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো এবং উল্কাবেগে অন্ধকারে উধাও হলো।

রহমান রাইফেল উদ্যত করে ধরলো, অন্ধকারে অশ্বারোহীকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়বে।

বনহুর হাত বাড়িয়ে ওর রাইফেলটা নিচু করে দিয়ে বললো—ওকে গুলী ছুঁড়োনা রহমান, ও আমার জীবনরক্ষাকারী....

পরবর্তী বই

দস্যু জাভেদ